উড়ালপঙ্খি

হুমায়ূন আহমেদ

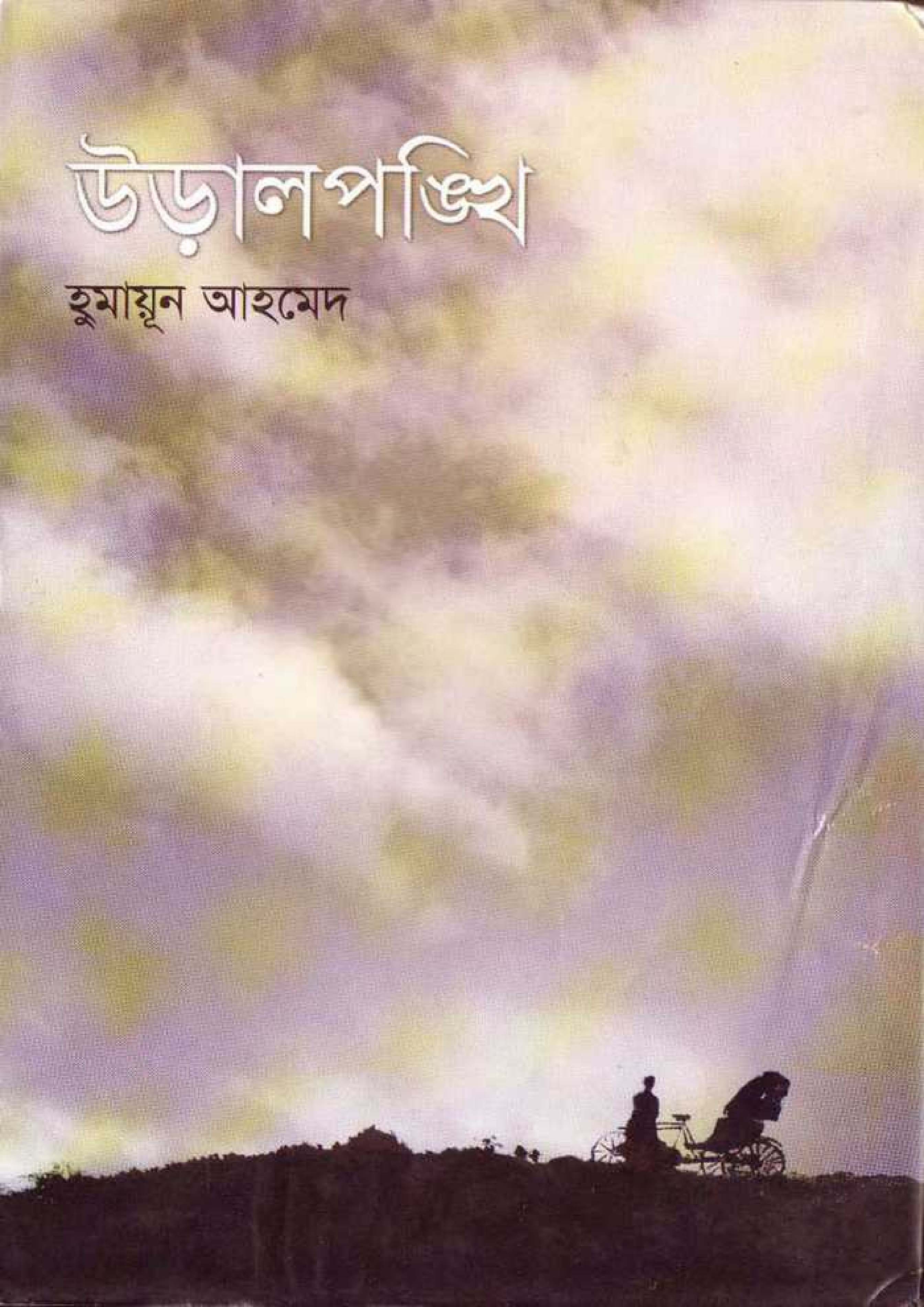

চতুর্থ প্রকাশ	নভেম্বর ২০০২
তৃতীয় প্রকাশ	অক্টোবর ২০০২
দ্বিতীয় প্রকাশ	অক্টোবর ২০০২
প্রথম প্রকাশ	অক্টোবর ২০০২
©	লেখক
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ	মাসুম রহমান
আলোকচিত্র	বিশ্বজিৎ সরকার
কম্পিউটার গ্রাফিক্স	লিটিল এম
প্রকাশক	মাজহারুল ইসলাম অন্যপ্রকাশ ৩৮/২-ক, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ ফোন : ৭১২৫৮০২ ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯৬৬৪৬৮১
মুদ্রণ	কালারলাইন প্রিন্টার্স ৬৯/এফ গ্রীনরোড, পান্থপথ, ঢাকা
মূল্য	৮০ টাকা
উত্তর আমেরিকা পরিবেশক	মুক্তধারা জ্যাকসন হাইট, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র
যুক্তরাজ্য পরিবেশক	সঙ্গীতা লিমিটেড ২২ ব্রিক লেন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য
Uralpankhi	By Humayun Ahmed Published by Mazharul Islam, Anyaprokash Cover Design : Masum Rahman Price : Tk. 80.00 only ISBN : 984 868 206 6

উৎসর্গ

আমার কিছু বন্ধুবান্ধব আছে
সপ্তাহে একবার যাদের মুখ না দেখলে মনে হয়
সপ্তাহটা ঠিকমতো পার হলো না। কিছু যেন বাদ পড়ে গেল।

শফিক-উল-করিম

আয়নার দিকে তাকিয়ে মুহিব চমকে উঠল। কাকে দেখা যাচ্ছে আয়নায়? এটা কি তার নিজেরই ছায়া? না-কি এক চোখা দৈত্য— সাইক্লপ!

যাকে দেখা যাচ্ছে তার বাঁ চোখ বন্ধ হয়ে আছে। খুব চেষ্টা করলে চোখের সাদা অংশ দেখা যায়, কালো মণি দেখা যায় না। গালের হনু উঁচু হয়ে আছে। থুতনির কাছে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। গালের হনু তো আগে উঁচু ছিল না। বেছে বেছে আজই উঁচু হয়ে গেল? সারা মুখে কেমন চিমশে ভাব চলে এসেছে। রাতে না ঘুমুলে এরকম হয়। কিন্তু গত রাতে তার ঘুম খুব ভালো হয়েছে। ঘুমের মধ্যে সে ইন্টারেস্টিং একটা স্বপ্নও দেখেছে। স্বপ্নটা এখন মনে পড়ছে না। দুপুরের দিকে মনে পড়বে। মুহিবের স্বপ্ন মনে পড়ে দুপুরের পর।

এই চেহারা দুরুস্ত করা যাবে কীভাবে? শেভ করে থুতনির দাড়ি ফেলে দেয়া যাবে। ক্রিম ঘষে মুখের চিমশে ভাব হয়তো বা কিছুটা কাটান দেয়া যাবে। কিন্তু বাঁ চোখের গতি কী হবে? এই চোখ নিয়ে প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া যায়, কিন্তু চাকরির ইন্টারভিউ দিতে যাওয়া যায় না। আজ সকাল এগারোটায় 'দ্যা এরনস' নামের একটা কোম্পানির সঙ্গে তার ইন্টারভিউ। তারা দ্বিতীয় দফায় ডেকেছে। দ্বিতীয়বার যখন ডাকছে তখন নিশ্চয়ই কোনো ঘটনা আছে। চোখের এই অবস্থা দেখলে কি ইন্টারভিউ বোর্ডের কর্তারা সেই বিশেষ ঘটনা ঘটাবেন? এখন বাজছে আটটা। হাতে আরো তিন ঘণ্টা সময় আছে। এই তিন ঘণ্টায় চোখের কোনো গতি করা যাবে কি?

জল-চিকিৎসা শুরু করলে কেমন হয়? যে-কোনো রোগের প্রথম চিকিৎসা হলো জল-চিকিৎসা। কিছু কিছু রোগের শুধু যে প্রথম চিকিৎসা তা-না, শেষ চিকিৎসাও। কথাগুলো মুহিবের বড় চাচা তৌফিকুর রহমান সাহেবের। পেনশন নিয়ে পাঁচ বছর ধরে তিনি বাড়িতে বসে আছেন। অবসর কাটাচ্ছেন নানাবিধ চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে পড়াশোনা করে। উনার কর্মকাণ্ড পড়াশোনায় সীমাবদ্ধ থাকলে ভালো হতো। তা নেই, তিনি বাড়িতে কিছু ভেষজ ওষুধও বানাতে শুরু করেছেন। তাঁর প্রথম প্রচেষ্টা Olive leaf extract. হামানদিস্তায় জলপাই

গাছের কচিপাতা পেষা হচ্ছে। তার সঙ্গে আগার-আগার মিশিয়ে ডালের বড়ির মতো বড়ি বানিয়ে রোদে শুকানো হচ্ছে। শুকানোর পর এই ঘোর কৃষ্ণবর্ণ বস্তুটাকে দেখাচ্ছে ছাগলের লাদির মতো। এই ছাগলের লাদি দৈনিক একটা করে খেলে নবযৌবন। কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ, আর্থ্রাইটিস, ডায়াবেটিস, ব্লাডপ্রেসার কিছুই থাকবে না। ছাগলের লাদি শরীরের সমস্ত দূষিত পদার্থ ব্লটিং পেপারের মতো শুষে নিয়ে নিবে। শরীরে চলে আসবে কমনীয় কান্তি।

মুহিব গত চারদিনে চারটা ট্যাবলেট খেয়েছে। আজ যদি খায় তাহলে শরীরে পঞ্চম ডোজ পড়বে। চোখে প্রবল বেগে পানির ঝাপ্টা দিতে দিতে তার মনে হলো— কোনো কারণ ছাড়াই এই যে তার চোখ ফুলে গেল, চেহারায় চিমশে ভাব চলে এসেছে, এইসব ছাগলের লাদির সাইড এফেক্ট না তো ? যে ওষুধে নবযৌবন নিয়ে আসবে তার কিছু সাইড অ্যাফেক্ট তো থাকারই কথা। নবযৌবন নিয়ে আসবে ঠিকই, সঙ্গে সঙ্গে নবযৌবন প্রাপ্ত মানুষটার একটা চোখ বসিয়ে দিয়ে যাবে।

দরজায় টোকা পড়ছে। মুহিবের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে, যে দরজায় টোকা দিচ্ছে সে কোনো একটা কাজ নিয়ে এসেছে। কাজ ছাড়া ভোরবেলায় কেউ বেকার যুবকের কাছে আসে না। হয়তো সকালের নাস্তার ময়দা নেই। মোড়ের দোকান থেকে ময়দা আনতে হবে। কিংবা চিঠি নিয়ে এক্ষুণি কারোর বাসায় যেতে হবে। সেই লোক অফিসে চলে যাবার আগেই তাকে ধরতে হবে।

যিনি দরজা ধাক্কাচ্ছিলেন তিনি এখন স্ব-গলায় জানান দিলেন। বিরক্ত গলা— মুহিব! মুহিব!

মুহিবের বড়ভাবি ইয়াসমিনের গলা। এই মহিলা অনেক পরিশ্রম করে তাঁর গলায় স্থায়ী বিরক্তি নিয়ে এসেছেন। স্বাভাবিক গল্পগুজবের সময়ও তাঁর গলায় রাজ্যের বিরক্তি ঝরে পড়ে। ভুরু কুঁচকে থাকে, চোখ সরু হয়ে যায়। মুহিব পানির কল বন্ধ করল। জল-চিকিৎসার এইখানেই ইতি।

এতক্ষণ ধরে দরজা ধাক্কাচ্ছি, ব্যাপার কী ?

বাথরুমে ছিলাম ভাবি, শুনতে পাই নি।

তোমার কি এখন কোনো জরুরি কাজ আছে ?

মুহিব হাসি মুখে বলল, আমার জরুরি কাজ থাকবে কী জন্যে ?

ইয়াসমিন তীক্ষ্ণ গলায় বলল, প্রশ্নের জবাব প্রশ্ন দিয়ে দেবে না। কাজ আছে কি নেই সেটা বলো।

কাজ নেই।

মাঝারি সাইজের দুটা ডিমওয়ালা ইলিশ মাছ এনে দিয়ে যাবে। পদ্মার ইলিশ আনবে। বার্মিজ ইলিশ পাওয়া যায়। ভুলেও বার্মিজটা আনবে না।

বার্মিজ ইলিশ পদ্মার ইলিশ চিনব কীভাবে?

মাছওয়ালাকে জিজ্ঞেস করবে। পদ্মার ইলিশ গোলগাল হয়। বার্মিজটা হয় লম্বা টাইপের। মুখ বোঁচা। আধাকেজি সরিষা আনবে। পুরনো সরিষা আনবে না। পুরনোটা তিতা হয়। আধাকেজি নতুন রাই সরিষা। কাগজি লেবু। কাঁচামরিচ। দুইশ গ্রাম জিরা। মনে থাকবে?

অবশ্যই মনে থাকবে।

মনে থাকবে না। ভুলে যাবে, কাগজে লিখে নাও।

ভাবি, মনে থাকবে। আমার স্মৃতিশক্তি ভালো।

কী কী আনতে হবে বলো তো শুনি?

দু'টা পদ্মার ইলিশ। আধাকেজি নতুন রাই সরিষা, কাগজি লেবু, কাঁচামরিচ, দুইশ গ্রাম জিরা। হয়েছে না? দশে দশ পেয়েছি কি-না বলো।

তুমি আসল ব্যাপারটাই ভুলে গেছ। ডিমওয়ালা ইলিশ। তোমার ভাই ইলিশ মাছ খাবে না। ইলিশ মাছের ডিমের ঝোল খাবে। এক হাজার টাকা রাখ। যা বাচে ফেরত দেবে।

অবশ্যই ফেরত দেব।

তোমার ভাইয়ের এক মহিলা কলিগ আছেন, নায়লা নাম। উনার মনে হয় কোনো কাজকর্ম নাই। প্রতিদিন একটা রান্নার রেসিপি বলেন। তোমার ভাই সেটা মাথায় করে বাসায় নিয়ে আসে।

মুহিব গলা নামিয়ে বলল, প্রেম-ট্রেম হয়ে যায় নি তো ভাবি?

আমার সঙ্গে রসিকতা করবে না। আমার রসিকতা ভালো লাগে না।

সরি।

বড়চাচা তোমাকে ডাকছেন। উনিও কী যেন আনাবেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করে যেও। আর দয়া করে এক্ষুণি একটা কাগজে লিখে নাও কী কী আনতে হবে।

মুহিব আবারো বাথরুমে ঢুকল। জল-চিকিৎসায় চোখের কিছু হয় নি। শেভ করে মোটামুটি ভদ্রস্থ হবার চেষ্টা করা দরকার। তার চোখের এই অবস্থাটা ভাবি লক্ষ করেন নি। এটা খুবই আশ্চর্যজনক ঘটনা। মনে হচ্ছে এই বাড়ির কেউ এখন তার দিকে ভালো করে তাকায় না। তাকালেও কিছু দেখে না। বোধহয় সে H. G. Wells-এর অদৃশ্য মানব হয়ে যাচ্ছে। একটা পরীক্ষা করা যেতে

পারে। সবার সামনে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করবে। অকারণেই কিছু কথাবার্তাও বলা হবে। দেখতে হবে যাদের সামনে ঘোরাঘুরি করা হলো তাদের মধ্যে কতজন বলে— 'আরে, চোখে কী হয়েছে ?' কেউ বলবে এরকম মনে হচ্ছে না।

তৌফিকুর রহমান দোতলার বারান্দায় ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে আছেন। তাঁর পায়ের পাতা রোদে, তিনি ছায়াতে। পায়ের পাতায় ওলিভ ওয়েল মাখানো। ওলিভ ওয়েল সূর্যের ক্ষতিকারক আলট্রা ভায়োলেট রশ্মি থেকে পা-কে রক্ষা করবে, আবার সূর্যের উপকারী রশ্মি যা শরীরে ভিটামিন ডি তৈরি করবে তাকে বাধাগ্রস্ত করবে না। তৌফিকুর রহমানের হাতে বিজ্ঞানের একটা বই। লেখকের নাম মিশিও কাকু। বইটার নাম 'হাইপার স্পেস'। ভোরবেলায় তিনি ধর্ম এবং বিজ্ঞানের বই পড়েন। রাতে পড়েন বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতি বিষয়ক বই। তৌফিকুর রহমান সাহেবের বয়স ষাটের উপরে। চিরকুমার থাকার কারণে কিংবা নানাবিধ চিকিৎসা পদ্ধতির কারণে চেহারায় বয়সের ছাপ পড়ে নি। যুবক বয়সে তিনি যে অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন তা এখনো বোঝা যায়। নিজের পোশাক-আশাক নিয়ে তিনি অত্যন্ত সচেতন। এই ভোরবেলাতেও তিনি ইস্ত্রি করা পাঞ্জাবি পরেছেন। নীল পাড়ের ধবধবে সাদা লুঙ্গি। কোলের উপর ঘিয়া রঙের পাতলা মটকার চাদর ফেলে রাখা। এখন আষাঢ় মাস। চাদরের প্রয়োজন নেই। এই চাদরটা তাঁর সাজসজ্জার অংশ।

মুহিব বড়চাচার পাশে এসে দাঁড়াল। তৌফিকুর রহমান বই থেকে মুখ না তুলেই বললেন, গুড মর্নিং। তোর খবর কী ?

মুহিব বলল, আমার খবর ভালো। আপনি আমাকে ডেকেছেন ?

না তো। ভোরবেলাটা আমি একা থাকতে পছন্দ করি। কাউকে ডাকাডাকি করি না।

মুহিব বলল, বড় ভাবির কাছে শুনলাম আপনি ডেকেছেন।

তৌফিকুর রহমান বই থেকে চোখ তুললেন। ইজিচেয়ারে সোজা হয়ে বসতে বসতে বললেন, মনে পড়েছে। বড় বৌমাকে বলেছিলাম তোকে খবর দিতে। তুই একবার সময় করে স্বর্ণকারের দোকানে যাবি। আমি রুপা এবং সোনা দিয়ে দু'টা হামানদিস্তা বানাব। কত খরচ পড়বে জেনে আসবি।

রুপা-সোনা দিয়ে হামানদিস্তা বানাতে হবে কেন ?

তৌফিকুর রহমান আগ্রহের সঙ্গে বললেন, রুপা আর সোনা হলো নন রি-অ্যাকটিভ মেটাল। নোবেল মেটাল। আমি যে-সব ওষুধপত্র বানাচ্ছি তার সঙ্গে নোবেল মেটালের তৈরি হামানদিস্তার কোনো রি-অ্যাকশন হবে না।

রুপা নন রি-অ্যাকটিভ আপনাকে কে বলল ? কিছুদিন রেখে দিলেই সিলভার অক্সাইডের কালো আস্তর পড়ে যায়। সোনা দিয়ে বানাতে পারেন। আধ সেরের মতো সোনা লাগবে। ছয় হাজার টাকা করে তোলা। লাখ দু'এক টাকা লাগবে।

বলিস কী ? এ তো দেখি বিরাট প্রবলেম!

পাথরের হামানদিস্তা ব্যবহার করতে পারেন। পাথর ইনার্ট বস্তু। পাথর কোনো রি-অ্যাকশন ফি-অ্যাকশনে যাবে না। ঝিম ধরে থাকবে।

তৌফিকুর রহমান উৎসাহের সঙ্গে বললেন, কথাটা ভালো বলেছিস। পাথরের হামানদিস্তার কথা আমার মনেই আসে নি। সোনা-রুপা নিয়ে ঘটঘট করছি। তুই খোঁজ নে— কী রকম দাম, কোথায় পাওয়া যায়।

আচ্ছা।

জলপাই পাতার এক্সট্রাক্ট খাচ্ছিস তো ?

হুঁ।

কী মনে হয়, উপকার পাচ্ছিস ?

বুঝতে পারছি না।

বুঝতে পারবি না কেন ? শরীরে সতেজ ভাব আসছে না ?

আসছে মনে হয়।

ট্রিটমেন্ট শুরুর আগে একবার লিপিড প্রোফাইল করানো হয়েছে। এক মাস পার হবার পর একটা লিপিড প্রফাইল করাবি। আগেরটার সঙ্গে মিলিয়ে দেখব অবস্থা কী। আসলে আমাদের সঙ্গে একজন ফুলটাইম ডাক্তার থাকা দরকার। তোর বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে ডাক্তার আছে ?

নাহ্। আমার সবই বেকার বন্ধু-বান্ধব। এদের মধ্যে যারা যারা চাকরি পাচ্ছে, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হয়ে যাচ্ছে। বেকাররা বেকার ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে মিশতে পারে না।

চাকরির ব্যাপারটা মাথা থেকে দূর করে দে। স্বাধীনভাবে কিছু করার চিন্তা-ভাবনা কর। দুইশ বছর ব্রিটিশদের গোলামি করার ফল এই হয়েছে— জাতিগতভাবে আমাদের ডিএনএ-র ভিতর ঢুকে গেছে যে-কোনোভাবে একটা চাকরি করতে হবে। তুই এর ভেতর থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা কর।

দেখি।

দেখাদেখির কিছু নেই। কনক্রিট চিন্তা-ভাবনা করে আমার কাছে আয়। অল্প-স্বল্প ক্যাপিটেলের ব্যবস্থা করা যাবে। আমার নিজেরও কিছু চিন্তা-ভাবনা আছে।

বড়চাচা, এখন তাহলে যাই ?

আচ্ছা যা, জলপাই এক্সট্রাক্ট-টা খেতে ভুল করবি না। রোজ ভোরবেলা একটা করে ট্যাবলেট।

ওষুধটার একটা নাম দেন না কেন! এক্সট্রাক্ট শুনতে যেন কেমন লাগে।

তৌফিকুর রহমান উৎসাহিত গলায় বললেন, ভালো কথা মনে করেছিস। আমিও নাম নিয়ে ভাবছি। কয়েকটা নাম মনে এসেছে। তুইও চিন্তা-ভাবনা কর। যে-সব নাম মাথায় আসে একটা কাগজে লিখে ফেল। তারপর একদিন বসে নাম সিলেক্ট করে ফেলব।

মুহিব বলল, এই মুহূর্তে আমার মাথায় একটা নাম ঘুরঘুর করছে। জলপাই-বটিকা। নামটা আপনার কাছে কেমন লাগছে ?

তৌফিকুর রহমানের মুখ সঙ্গে সঙ্গে কঠিন হয়ে গেল। তিনি কড়া গলায় বললেন, জলপাই-বটিকা মানে ?

মুহিব মিনমিন করে বলল, দেশী ওষুধের দেশী নাম।

তৌফিকুর রহমান গম্ভীর গলায় বললেন, তোর কথার ধরন দেখে আমার মনে হচ্ছে, তুই পুরো ব্যাপারটি খুব হালকাভাবে দেখছিস। আমি এনয়েড বোধ করছি। আমি আর দশটা পেনশন খাওয়া মানুষের মতো না। আমি কোনো খেলা খেলছি না। আচ্ছা ঠিক আছে, এখন যা। তোর সঙ্গে পরে এই নিয়ে কথা হবে।

মুহিব সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় বাঁ চোখে একবার হাত দিল। যা ভাবা গেছে তাই। জল-চিকিৎসায় উল্টা রিঅ্যাকশন হয়েছে। চোখ আরো ফুলেছে। বড়চাচার চোখে পড়ে নি। পড়ার কথাও না। তিনি কারোর মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলেন না। মুহিবের ধারণা— তিনি যদি সরাসরি তার মুখের দিকে তাকিয়েও কথা বলতেন তাহলেও চোখে পড়ত না।

মুহিবের মা মনোয়ারা রান্নাঘরে। চুলা থেকে দূরে দেয়ালের সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে উঁচু জলচৌকিতে বসে আছেন। রান্নাবান্না তদারকির জন্যে তিনি অর্ডার দিয়ে জলচৌকিটা বানিয়ে নিয়েছেন। জলচৌকির উপর নারিকেলের ছোবড়া গদিও আছে। সকালের নাশতার সময় তিনি এসে জলচৌকিতে বসেন। দুপুরে রান্না না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই থাকেন। সবকিছু তার চোখের সামনে হতে হয়। তাওয়া থেকে পরোটা নামানোর সময় প্রতিটি পরোটা তাকে দেখিয়ে নিতে হয়। তিনি সারাক্ষণই নির্দেশ দিতে থাকেন— মতির মা! এর নাম পরোটা ভাজা ? এক পিঠ হয়েছে আরেক পিঠ কাঁচা। তেলে চপচপ করছে। আমার কি তেলের খনি আছে ? একটা পরোটার জন্য যে পরিমাণ তেল দিয়েছ এই তেলে ছোটখাট দু'টা পরিবারের এক মাসের রান্না হয়। তোমাকে দিয়ে আমার পোষাবে না

মতির মা। তুমি বরং বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট সাহেবের বাড়িতে বাবুর্চির কাজ পাও কি-না দেখ। আমার বাড়িতে তোমাকে দিয়ে হবে না।

মনোয়ারার অভ্যাস ঘনঘন চা এবং জর্দা দিয়ে পান খাওয়া। হয় তার মুখে ময়মনসিংহের স্পেশাল জর্দার পান থাকবে আর নয়তো চা থাকবে। মুখ কখনো খালি থাকবে না। মাঝে মাঝে দু'টাই এক সঙ্গে থাকে। গালের এক পাশে পান জর্দা রেখে দিয়ে অন্য পাশ দিয়ে তিনি না-কি চা খেতে পারেন। তাঁর কোনোই সমস্যা হয় না। তিনি প্রেসারের রোগী। রান্নাঘরে চুলার গরমে তাঁর থাকা নিষেধ, কিন্তু তিনি থাকবেন। এবং তার দুই পুত্রবধূর কারোর না কারোর সঙ্গে একটা ঝগড়ার সূত্রপাত করবেন। এই ঝগড়া তিনি একাই অনেকদূর টেনে নিয়ে যাবেন। রাগ দেখিয়ে দুপুরে ভাত না খেয়ে দরজা বন্ধ করে ঘুমুতে যাবেন। অনেক সাধ্য সাধনা করে সন্ধ্যাবেলায় তার রাগ ভাঙানো হবে। তিনি অবেলায় খেতে বসবেন। ভাত খাবার ঘণ্টাখানিকের মধ্যে তাঁর মেজাজ পুরোপুরি ঠিক হয়ে যাবে। যার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে রাতে তাকে পাশে নিয়েই ডিভিডি প্লেয়ারে হিন্দি ছবি দেখতে বসবেন। ডিভিডি প্লেয়ারটা তাঁর মেজো মেয়ের জামাই সৌদি আরব থেকে পাঠিয়েছে। এটা তাঁর শোবার ঘরে টেলিভিশনের সঙ্গে সেট করা। তিনি প্রতি রাতে ঘুমুবার আগে একটা ছবি দেখেন। এই সময় বাড়ির সব মেয়েকে (কাজের দুটি মেয়েসহ) তাঁর পাশে থাকতে হয়। ছবি দেখা তাঁর অভ্যাসের মতো হয়ে গেছে। যে রাতে তিনি ছবি দেখতে পারেন না সে রাতে তাঁর ঘুম হয় না। প্রেসারে সমস্যা হয়। নিচেরটা ১২০-১২৫ হয়ে যায়।

মুহিব মায়ের খোঁজে রান্নাঘরে ঢুকল। মুহিবের আসল উদ্দেশ্য তার চোখ ফোলাটা মা'র নজরে পড়ে কি না। মুহিব বলল, মা চা হবে ?

মনোয়ারা বললেন, না, চুলা দু'টাই বন্ধ।

তোমার লাগবে কিছু ? নিউ মার্কেটে যাব।

ভিডিও'র দোকান থেকে একটা ছবি নিয়ে আসিস।

কী ছবি আনব, নাম বলো।

'কয়লা' নামে কোনো ছবি আছে কি-না দেখিস তো। বোবার কাহিনী। শাহরুখ খান আছে, মাধুরী আছে, অমরেশপুরী আছে। সবাই দেখে ফেলেছে, আমার দেখা হয় নি।

জর্দা-টর্দা কিছু লাগবে না ?

না। রান্নাঘরে এতক্ষণ থাকবি না। কাজের মেয়েরা রান্নাঘরে থাকে। রান্নার সময় এদের কাপড়-চোপড়ের দিকে নজর থাকে না। এই জন্যে পুরুষ মানুষের রান্নাঘরে ঘুরঘুর আমার খুবই অপছন্দ।

মা, একটু দেখ না এক কাপ চা দেয়া যায় কি-না।

বললাম তো— না। একটা কথা পঞ্চাশবার করে বলতে হবে ?

মুহিব রান্নাঘর থেকে বের হলো। তার চোখের অবস্থা মনোয়ারার নজরে পড়ল না। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার! সে কি সত্যি সত্যি ইনভিজিবল ম্যান হয়ে যাচ্ছে ? সব বেকার যুবকের ক্ষেত্রেই কি এটা ঘটে ? থাকে মানুষ— এক সময় হয়ে যায় ছায়া মানুষ। Shadow Man.

খাবার ঘরের ডাইনিং টেবিলে নাশতা দেয়া হয়েছে। মুহিবের বড় দুই ভাই পাশাপাশি গম্ভীর মুখে বসে আছে। দু'জনকেই চরম বিরক্ত বলে মনে হচ্ছে। বড় ভাই তোফাজ্জল করিমের হাতে খবরের কাগজ। খবরের কাগজ আগে কেউ পড়ে ফেললে সে পড়তে পারে না। এই কারণেই ইয়াসমিন বাড়িতে খবরের কাগজ আসা মাত্র স্বামীর হাতে তুলে দেয়। সকালবেলার মতো ইয়াসমিনের কাজ শেষ। সে চায়ের কাপ হাতে নিজের ঘরে ঢুকে যায়। সবার নাশতা খাওয়া শেষ হবার পর বাড়ি যখন নীরব হয় তখন সে ধীরে সুস্থে নাশতা খেতে বের হয়। কোনোরকম হৈচৈ ইয়াসমিনের পছন্দ হয় না। তার মাথা ধরে যায়।

মেজো ভাই মোফাজ্জল করিমের স্ত্রী রোকেয়ার সকালটা কাটে অসম্ভব ব্যস্ততায়। রোকেয়ার দায়িত্ব হলো তার দুই মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দেয়া। মেয়ে দু'টা যমজ। একজনের নাম ক, আরেকজনের নাম খ। যমজ মেয়ে হবার সংবাদে খুশি হয়ে মোফাজ্জল করিম দুই মেয়ের এই অদ্ভুত নাম রেখেছে। মেয়ে দু'টির জন্ম একুশে ফেব্রুয়ারিতে। সেই হিসেবে নাম দু'টির হয়তো বা খানিকটা গুরুত্ব আছে। ক এবং খ দুই বোনই স্কুলের যাবার আগে আগে খুব যন্ত্রণা করে। কান্নাকাটি না, হৈচৈ চিৎকার না। ভারী কোনো কিছু আঁকড়ে ধরে বসে থাকে। কার সাধ্য তাদের ছুটিয়ে নিয়ে স্কুলে যায়। ক খ দুই বোনের যন্ত্রণায় বাড়ির সবাই অস্থির। তবে যন্ত্রণার পুরোটাই নীরব যন্ত্রণা। বাড়ির কেউ দুই মেয়েকে কখনো কাঁদতে শুনে নি।

মুহিব বসার ঘরে ঢুকতেই মোফাজ্জল ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, তোর ভাবিকে একটু সাহায্য কর তো। বিচ্ছু দু'টাকে রিকশায় তুলে দে। এরা আমার জীবন নষ্ট করে ফেলল। যে-কোনো একদিন দেখবি বাড়িঘর ছেড়ে সুন্দরবনের দিকে হাঁটা দিয়েছি।

মুহিব কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। দুই ভাইকে সুযোগ দিল তার দিকে ভালো করে তাকাবার। চোখ নিয়ে কেউ কিছু বলে কি-না তার জানার শখ। কেউ কিছু বলল না। বড় ভাই খবরের কাগজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে। মেজোজন চামচ দিয়ে ঠ্যানঠ্যানা পাতলা খিচুড়ি মুখে দিচ্ছে। তার চোখমুখের ভঙ্গি এরকম যেন— চামচে করে ইঁদুর মারা বিষ খাচ্ছে।

ন'টা দশ বাজে।

মুহিব বসে আছে খায়রুল মিয়ার টি-স্টলে। আল মদিনা রেস্টুরেন্ট। পরোটা, বুন্দিয়া এবং ডিমের ওমলেট দিয়ে সকালের নাশতা করেছে। প্রথম কাপ চা খাওয়া হয়ে গেছে, এখন খাচ্ছে দ্বিতীয় কাপ চা। দ্বিতীয় কাপ চা খাবার ইচ্ছা তার ছিল না। খায়রুল মিয়ার জন্যে খেতে হচ্ছে। সে দু'কাপ চা হাতে নিয়ে নিজেই এসে সামনে বসেছে। পান খাওয়া কুচকুচে কালো দাঁত বের করে ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল— ভাইজান নেন, ইসপিসাল চা। কাচা পাত্তি।

খায়রুল মিয়া একজন গলাবিহীন মানুষ। তাকে দেখে মনে হয় তার মাথাটা সরাসরি ঘাড়ে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। আল্লাহপাক গলার ঝামেলায় যান নি। ছোটবেলায় কী যেন সমস্যা হয়ে ভোকাল কর্ড নষ্ট হয়ে গেছে। তার বেশির ভাগ কথাই অস্পষ্ট। খায়রুল মিয়া এই সমস্যা জানে বলেই প্রায় সব বাক্যই সে দু'বার তিনবার করে বলে।

আল মদিনা রেস্টুরেন্টে মুহিব দীর্ঘদিন ধরে চা খাচ্ছে। মানুষটার সঙ্গে মুহিবের ভালো খাতির আছে। খায়রুল নামের মানুষটার পরিশ্রম করার ক্ষমতা এবং ব্যবসাবুদ্ধি দেখে সে মুগ্ধ। ছাপড়া ঘর দিয়ে টি-স্টল শুরু করেছিল। তখন সে নিজেই চা বানাত। আজ সেই টি-স্টল হুলুস্থুল ব্যাপার হয়েছে। বিরাট সাইন বোর্ড— দি আল মদিনা রেস্টুরেন্ট। দুপুরে এই রেস্টুরেন্টে সিট পাওয়া কঠিন ব্যাপার। আল মদিনা'র মুড়িঘণ্ট এবং গরু ভুনার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। পাশের ঘরটাও খায়রুল মিয়া নিয়ে নিয়েছে। সেখানে বসেছে টেলিফোনের দোকান। টিএন্ডটি এবং মোবাইল লাইন। সস্তায় দেশে-বিদেশে টেলিফোনের সুযোগ। এর সঙ্গে জিরক্স মেশিন আছে, স্টেশনারি জিনিসপত্র, বই-খাতা, পেনসিলও পাওয়া যায়। খায়রুল মিয়ার রেস্টুরেন্ট যেমন চালু এই দোকানটাও সে-রকমই চালু। এখন খায়রুল মিয়ার মাথায় ঢুকেছে শাড়ির দোকান। বেইলী রোডে সে একটা শাড়ির দোকান দিতে চায়।

খায়রুল বলল, ভাইজানের চোখে কী হয়েছে?

মুহিব বলল, জানি না।

পোকায় কামড় দিছে? পোকা-মাকড় কামড় দিছে?

দিতে পারে।

ওষুধপত্র কিছু দিছেন?

উঁহু।

ব্যথা আছে? ব্যথা?

মুহিব জবাব দিল না। চোখ প্রসঙ্গে এত কথা বলতে তার ইচ্ছা করছে না। খায়রুল তার দিকে ঝুঁকে এসে বলল, শাড়ির দোকানটা নিয়ে চিন্তা নিছেন ? নিছেন কোনো চিন্তা ?

কী চিন্তা নেব ?

আপনাকে কী বলেছি— পুরাটা আপনার হাতে দিয়ে দিব। ক্যাপিটেল আমার, ব্যবসা আপনার। মাসের শেষে হিসাব-নিকাশ হবে।

আরে দূর দূর।

দূর দূর কী জন্যে ? ব্যবসা কি খারাপ জিনিস ? আমাদের নবিজি কি ব্যবসা করেন নাই ? করেন নাই ব্যবসা ? আমাদের নবিজি।

মুহিব বিরক্ত গলায় বলল, নবিজি শাড়ির দোকান দেন নাই। মেয়েরা আসবে, গায়ের উপর শাড়ি ফেলে দেখাতে হবে শাড়ি গায়ে দিলে কেমন লাগবে। তিনশ শাড়ি নামাবে, কচলায়ে কচলায়ে দেখবে, তারপর না কিনে চলে যাবে পাশের দোকানে। আমি এর মধ্যে নাই।

ভাইজান, এইগুলা তো আপনি করবেন না। কর্মচারী এইগুলা করবে।

আমি কী করব ?

আপনি ক্যাশ দেখবেন। ব্যবসা দেখবেন।

আমি ক্যাশবাক্সের সামনে বসে টাকা গুনব ? ভুলে যান।

ফট করে না বলা ঠিক না। চিন্তা করেন। চিন্তা করেন। চিন্তা করেন। চিন্তার প্রয়োজন আছে।

এটা নিয়ে চিন্তা করার কিছু নাই।

দোকান শুরু করতে আমার দেরি আছে। আরো দুই তিনমাস লাগবে। আপনি চিন্তা করেন। আপনাকে তো আমি কর্মচারী হতে বলতেছি না— আমি ব্যবসার শেয়ার দিব।

চুপ করেন তো দেখি। ফ্যাসফ্যাস করে অনেক কথা বলে ফেলেছেন। আরো কথা বললে গলা পুরোপুরি অফ হয়ে যাবে। নিঃশব্দে চা খান। আমি এখন কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিচ্ছি। কথা বললে আমার ডিসটার্ব হবে। সিদ্ধান্ত নিতে পারব না।

কী সিদ্ধান্ত ?

কী সিদ্ধান্ত সেটা আপনার জানার দরকার নাই। আপনার শাড়ির দোকান বিষয়ক সিদ্ধান্ত না। ব্যক্তিগত ব্যাপার।

আমি কি আপনার সামনে থেকে চলে যাব ? চলে যাব ভাইজান ?

যান, চলে যান।

খায়রুল মিয়া উঠে গেল। হাসান ঘড়ির দিকে তাকাল— সাড়ে ন'টা বাজে। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এই মুহূর্তে নিয়ে নিতে হবে। হাতে সময় নেই।

সিদ্ধান্ত এক.

ইলিশ মাছ কেনার জন্যে নিউ মার্কেটে যাওয়া যাবে না। ইলিশ মাছ কিনতে গেলে যথাসময়ে চাকরির ইন্টারভিউতে হাজির হওয়া যাবে না।

সিদ্ধান্ত দুই.

ইলিশ মাছ কাউকে দিয়ে কেনাতে হবে। দায়িত্বটা দিতে হবে খায়রুল মিয়াকে। এই লোকটি নিখুঁতভাবে দায়িত্ব পালন করবে।

সিদ্ধান্ত তিন.

যেহেতু মাছ কিনতে যাওয়া হচ্ছে না, হাতে সময় আছে— এই সময়টা আনন্দে কাটানোর ব্যবস্থা করতে হবে। টেলিফোনে নোরার সঙ্গে কথা বলা যায়। তার একটা বিপদ অবশ্যি আছে। নোরা বলে বসতে পারে— 'কী করছ, এক্ষুণি চলে আস তো।' নোরা বললে অবশ্যই সব ফেলে দিয়ে চলে যেতে হবে। ইন্টারভিউ দেয়া হবে না। তখন মনে হবে কীসের ইন্টারভিউ, কীসের কী ?

মুহিব ভুরু কুঁচকে আছে। সে যে গভীর চিন্তায় ডুবে আছে এটা তার লক্ষণ। তার বুকে ধুকধুক শব্দ হচ্ছে। ধুকধুক শব্দ নিশ্চয়ই সারাক্ষণ তার বুকে হচ্ছে। কিন্তু সে শুনতে পায় শুধু যখন তার ভুরু কুঁচকে থাকে। ব্যাপারটা কি শুধু তার একার ক্ষেত্রে ঘটে, না সবার ক্ষেত্রে ঘটে ? দি আল মদিনা রেস্টুরেন্টের মালিক খায়রুল মিয়ার বুকও কি গভীর চিন্তার সময় ধুকধুক করে ?

খায়রুল মিয়া তার পাশে রাখা চিলমচিতে পানের পিক ফেলতে ফেলতে বলল, ডিমওয়ালা ইলিশ কিনবেন কী জন্যে ? ডিমওয়ালা ইলিশে স্বাদ হবে না।

মুহিব বলল, স্বাদের দরকার নাই, আমার দরকার ডিম। বড়ভাইজানের খায়েস হয়েছে ইলিশ মাছের ডিম খাবেন।

তাহলে এক কাজ করি, ধূপখোলার বাজারে ইলিশ মাছের ডিম আলাদা বিক্রি হয়। সেখান থেকে ডিম কিনে আনি আর আলাদা একটা ডিমছাড়া ইলিশ কিনি। ডিম আলাদা। মাছ আলাদা।

যা ইচ্ছা করেন, শুধু মনে রাখবেন সকাল সকাল বাজার পৌছাতে হবে। লিস্টে যা যা লেখা সব যেন যায়। আরেকটা কথা, আমার সঙ্গে কথা বলার সময় দু'বার তিনবার করে কিছু বলবেন না। শুধু শুধু সময় নষ্ট। আমি আপনার ঠোঁট নাড়া দেখেই বুঝতে পারি কী বলছেন।

আপনি যান কই ?

আমি কোথায় যাই তা দিয়ে আপনার কোনো দরকার নেই। যা করতে বলছি করেন।

কাঁচা সুপারি দিয়ে একটা পান খাবেন ? হার্টের জন্যে ভালো।

পান খাব না। আমার হার্টের ট্রিটমেন্টের প্রয়োজন নেই। হার্ট ভালো আছে। বকরি লাদির ট্রিটমেন্ট চলছে।

খায়রুল মিয়া গলা নামিয়ে বলল, ভাইজান, আজ সন্ধ্যার পর কি কোনো কাজ আছে ?

কেন ?

আমি যে ফ্ল্যাটটা কিনলাম আপনাকে দেখাতাম। মনে খায়েশ ছিল।

দেখি, যদি সময় করতে পারি।

ফার্নিচার কিনি নাই। আপনাকে সাথে নিয়ে কিনব।

আমাকে সাথে নিয়ে কিনবেন কেন ?

কোনটা ভালো কোনটা মন্দ এটা তো আমি বুঝব না। বুঝেন না ভাইজান— আমি পথের কাঙাল ছিলাম। পঞ্চাশ টাকা ভাড়ার বস্তির ছাপড়ায় থাকতাম। এখন পয়সা হয়েছে, কিন্তু মনের কাঙাল ভাব দূর হয় নাই।

দেখি, যদি সময় করতে পারি...

খুবই খুশি হবো ভাইজান। রাতে আমার সাথে খানা খাবেন। কী খাবেন বলেন— খিচুড়ি আর মুরগি ঝালফ্রাই করি। মুরগি ঝালফ্রাই মজনু বাবুর্চিকে দিয়ে করাব। একবার খেলে বাকি জীবন আর ভুলতে পারবেন না। বলি মজনু বাবুর্চিকে ? বলি ভাইজান, বলি ?

মুহিব প্রশ্নের জবাব না দিয়ে রেস্টুরেন্ট থেকে বের হলো। এখানে থাকা মানেই খায়রুল মিয়ার বকবকানি শোনা। সে বকবক করেই যেতে থাকবে। অতি ব্যস্ত মানুষদের বকবক করার স্বভাব থাকে না। এই লোকটার আছে। তার গলা দিয়ে শব্দ বের হয় না। তারপরেও সে কথা বলতেই থাকে।

খায়রুল মিয়ার টেলিফোনের দোকান থেকে মুহিব নোরাকে টেলিফোন করল। প্রথমবার রিং হতেই নোরা ধরল। 'হ্যালো' শব্দটা এত সুন্দর করে বলল যেন এটা কোনো ইংরেজি শব্দ না, এটা বাংলা গানের সঞ্চারী। মুহিব বলল, কী খবর নোরা ?

নোরা বলল, আপনি কে বলছেন জানতে পারি কি ?

বুকে ধাক্কা লাগার মতো বাক্য। এখনো কি নোরা তার গলা আলাদা করে চিনতে পারে না ? না-কি সে চিনেও ভান করে চিনতে পারছে না। অবশ্যি এও হতে পারে যে— 'আপনি কে বলছেন জানতে পারি কি' বাক্যটি নোরা অভ্যাসবশত বলে। হয়তো খুব ছোটবেলায় তাকে শেখানো হয়েছে— কেউ টেলিফোন করলে প্রথমেই বলবে— 'আপনি কে বলছেন জানতে পারি কি ?' যে টেলিফোন করেছে তার পরিচয় জানার পর অন্য কথা বলবে। ছোটবেলার অভ্যাস এখনো রয়ে গেছে।

নোরা, আমি মুহিব।

ও আচ্ছা, তুমি ? কী করছ ?

কিছু করছি না।

নোরা খিলখিল করে হাসতে হাসতে বলল, আমি কী করছি বলো তো ? তুমি কল্পনা করতে পারবে না এমন একটা জিনিস করছি।

সেটা কী ?

নোরা হাসি থামিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, সিগারেট খাচ্ছি। সকালে চায়ের সঙ্গে প্রথম সিগারেট খেয়েছি। এখন তো প্রায় দশটা বাজছে, এর মধ্যে চারটা সিগারেট খেয়ে ফেলেছি। চতুর্থটা এখনো শেষ হয় নি। হাতে আছে।

মুহিব বিস্মিত গলায় বলল, সিগারেট খাচ্ছ কেন ?

খেয়ে দেখছি কেমন লাগে। তেমন কোনো গুড ফিলিং হচ্ছে না, তবে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। খুব পানির পিপাসা হচ্ছে। এক জগ পানি খেয়ে ফেলেছি, তারপরেও পানির পিপাসা যাচ্ছে না।

মুহিব বলল, সত্যি সিগারেট খাচ্ছ ?

নোরা বলল, হ্যাঁ। না খেলে মিথ্যা করে কেন বলব ? এই মুহূর্তে আমি কী করছি মন দিয়ে শোন। আমি ডিভানে শুয়ে আছি। আমার হাতে একটা বই। বইটার নাম— Easy Hypnosis. বাবাকে বলে দিয়েছিলাম আমেরিকা থেকে আসার সময় আমার জন্যে মেসমেরিজম আর হিপনোটিজমের বই আনতে। বাবা হিপনোটিজমের দু'টা বই এনেছেন। একটা শেষ করে ফেলেছি। দ্বিতীয়টা পড়ছি। আঠারো পৃষ্ঠা পড়া হয়ে গেছে।

হঠাৎ হিপনোটিজমের বই পড়ছ কেন ?

কী করে মানুষকে হিপনোটাইজ করা যায় এটা শেখার জন্যে। পুরোপুরি শেখার পর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ম্যাজিশিয়ানরা যেমন যাদু দেখায় আমি হিপনোটিজমের খেলা দেখাব। কোনো একজন দর্শককে স্টেজে ডেকে এনে হিপনোটাইজ করব। তারপর তাকে বলব— আপনি এখন মানুষ না। আপনি একটা বড় সাইজের কোলা ব্যাঙ। আপনি স্টেজে লাফাতে থাকুন। সে তখন ব্যাঙের মতো লাফাতে লাফাতে স্টেজের এ-মাথা ও-মাথা যাবে। মজা হবে না ?

হবার তো কথা।

এই শোন, তুমি যেখানে আছ সেখান থেকে কি আকাশ দেখা যায় ?

হ্যাঁ যায়।

আকাশে মেঘ আছে ?

সামান্য, বেশি না। কেন বলো তো ?

আকাশ যদি খুব মেঘলা হয়ে থাকত আর ঝুমঝুম করে বৃষ্টি পড়ত, এক্ষুণি বৃষ্টি হবে, এক্ষুণি বৃষ্টি হবে ভাব থাকত তাহলে তোমাকে আসতে বলতাম।

আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছে। মনে হয় সন্ধ্যার দিকে বৃষ্টি হবে। তুমি বললে আমি চলে আসতে পারি। আমার কোনো কাজ নেই।

তোমার কাজ না থাকলেও আমার আছে। আমি এখন গভীর মনোযোগ দিয়ে বই পড়ছি। তবে ঝুমঝুম করে বৃষ্টি হলে অবশ্যই তোমাকে আসতে বলতাম। আচ্ছা শোন, ঝুমঝুম করে বৃষ্টি শুরু হলে তুমি চলে এসো। আসার সময় আমার জন্যে দু'টা জিনিস নিয়ে আসবে। একটা হচ্ছে লটকন।

অবশ্যই লটকন নিয়ে আসব। আরেকটা কী ?

সিডির দোকানে যাবে। একটা গানের সিডি কিনে আনবে— নাম 'উড়ালপঙ্খি'।

সিংগারের নাম বলে দাও।

কী আশ্চর্যর কথা, সিংগারের নাম তুমি জানো না ?

না। তোমার গাওয়া না-কি ?

হ্যাঁ।

কবে বের হয়েছে ?

গত মাসে।

কই আমাকে তো কিছু বলো নি!

এটা কি ঢাক পিটিয়ে বলার মতো কোনো ঘটনা ? এমন তো না এটা আমার জীবনের প্রথম সিডি। কাসুন্দি আনতে পারবে ? কাসুন্দি দিয়ে লটকন মাখিয়ে ভর্তা বানিয়ে খাব। এখন সব বড় বড় গ্রোসারি সপে পাওয়া যায়।

পাওয়া গেলে নিয়ে আসব।

ঝুম বৃষ্টি নামলে তবেই আসবে। খটখটে শুকনা সময়ে যদি আস তাহলে আমি কিন্তু উপর থেকে নিচেই নামব না। আমি টেলিফোন রেখে দিচ্ছি। আমার গায়ের উপর সিগারেটের ছাই পড়ে গেছে। সিগারেট খাবার সবচে' বিরক্তিকর অংশ হলো ছাই ঝাড়া। সাইনটিস্টরা এত কিছু আবিষ্কার করছে— ছাইবিহীন সিগারেট আবিষ্কার করতে পারছে না কেন ?

খট করে শব্দ হলো। নোরা তার অভ্যাসমতো হঠাৎ টেলিফোন রেখে দিয়েছে। মুহিব এখনো রিসিভার কানে ধরে আছে। ক্লান্তিকর টু টু শব্দ। মুহিবের মনে হলো সে অনন্তকাল ধরে টেলিফোন রিসিভার কানে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কান থেকে রিসিভার নামাতে ইচ্ছা করছে না। এখন সে যদি নোরাকে আবারো টেলিফোন করে, নোরা আগের মতোই বলবে— আপনি কে বলছেন জানতে পারি কি ? মুহিব যদি তার পরিচয় দেয় তাহলে সে আবারো উৎসাহের সঙ্গে কথা বলা শুরু করবে। তারপর এক সময় আচমকা বলবে— রাখি কেমন ? বলেই খট করে টেলিফোন রেখে দেবে।

নোরাকে আরেকবার টেলিফোন করতে ইচ্ছা করছে কিন্তু হাতে সময় নেই। ইন্টারভিউ দিতে যেতে হবে। ছয়-সাতজন গম্ভীর এবং বিরক্ত মুখের মানুষের সামনে হাসি হাসি মুখ করে বসতে হবে। বিরক্ত মানুষরা সবাই ভাব করবে— তারা সাধারণ কেউ না, তারা অতীশ দীপঙ্কর টাইপ মহাজ্ঞানী। এদের মধ্যে একজন থাকবে চার্লি চ্যাপলিন ধাঁচের। রসিকতা করার চেষ্টা করবে, ফাজলামি করার চেষ্টা করবে। কথা বলবে গ্রাম্য ভাষায়। তার ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ খাঁটি ব্রিটিশ একসেন্টে ইংরেজিতে কথা বলবে। বুঝানোর জন্যে যে আমি একটু আগে গ্রাম্য ভাষায় কথা বলছি এটা আমার পরিচয় না। গ্রাম-প্রীতির কারণে কাজটা করেছি। একজন থাকবে, যে-কোনো প্রশ্ন করবে না— তার কাজ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা। ভাব এরকম যে, আমার প্রশ্ন করার দরকার নেই। মুখের দিকে তাকিয়েই আমি সবকিছু বুঝে ফেলতে পারি। একজন থাকবে বিজ্ঞান-মনস্ক টাইপ। বিজ্ঞানের জটিল সব প্রশ্ন করবে, যার উত্তর দেয়া সম্ভব না। উত্তর না পেয়ে সেই গাধা মাথা নাড়তে নাড়তে মধুর ভঙ্গিতে হাসবে। হাসি দিয়ে বুঝিয়ে দেবে— এখনকার ছেলেমেয়েরা বিজ্ঞানের কিছুই জানে না। এতে সে অত্যন্ত ব্যথিত।

মুহিব তার চার বছরের বেকার জীবনে অনেক ইন্টারভিউ দিয়েছে। প্রতিটা ইন্টারভিউর একই চেহারা। দ্যা এরনসে সে চার মাস আগে একবার ইন্টারভিউ দিয়েছে। তার দ্বিতীয়বার ডাক পড়েছে। দ্বিতীয়বার ডাকের অর্থ কি এই যে চাকরি হবে ? মুহিবের তা মনে হয় না। তার ধারণা এই কোম্পানির কোনো কাজ-কর্ম নেই। কোম্পানির ডিরেক্টররা চার পাঁচবার করে ইন্টারভিউ নিয়ে কাজ দেখাচ্ছেন। প্রথমবারের ইন্টারভিউ মোটেই ভালো হয় নি। সে কোনো প্রশ্নের জবাব পারে নি। এক ভদ্রলোক হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন— 'মর্মাহত' শব্দটার মানে কী ? বাংলায় কথা বলার সময় আমরা প্রায়ই বলি— এই ঘটনায় আমি মর্মাহত। অর্থাৎ সে মর্মে আহত। মর্ম জিনিসটা কী ?

মুহিব শুকনা গলায় বলেছিল, জানি না স্যার।

মর্ম কী তুমি জানো না ?

জি-না স্যার।

তোমার কোনো অনুমান আছে ? তোমার কী মনে হয়— মর্ম কী ?

আমার ধারণা মর্ম হলো মন।

মন মানে কী ?

মুহিব অস্বস্তির সঙ্গে বলল, মন হলো চেতনা। ইন্টারভিউ বোর্ডের সবাই হো হো করে হাসতে শুরু করল। তাদের ভাব এরকম যেন জীবনে এত হাসির কথা কেউ শুনে নি। তখন চার্লি চ্যাপলিন বাবাজি গম্ভীর গলায় বললেন, আপনার নাম মুহিব। মুহিব নামের অর্থ কী ?

মুহিব বলল, মুহিব নামের অর্থ প্রেমিক।

আবারো হাসি শুরু হলো।

এইখানেই তার ইন্টারভিউর সমাপ্তি। বলা যেতে পারে হাস্যকর সমাপ্তি। এ ধরনের ইন্টারভিউর পর আবারো তাকে কেন ডাকা হলো সে জানে না। জানার দরকারও নেই। তার জীবনটা একটা রুটিনের ভিতর পড়ে গেছে। এই রুটিনে মাঝে মধ্যে তাকে ইন্টারভিউ দিতে হবে। সে দিয়ে যাচ্ছে। ব্যস।

মাঝারি ধরনের ঠাণ্ডা ঘরে মুহিব বসে আছে। ঘরে এসি চলছে। দরজা-জানালা সবই বন্ধ। মুহিব ছোটখাট এক ভদ্রলোকের সামনে বসে আছে। ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের উপরে বলে মনে হচ্ছে। কত উপরে তা ধরা যাচ্ছে না। ভদ্রলোকের চেহারা শান্ত। তাকানোর ভঙ্গি শান্ত। কিছু কিছু মানুষ আছে প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝার সময়ও যাদের দেখে মনে হয় বেশ শান্তিতে আছেন। ভদ্রলোক ঐ টাইপের। তিনিই সম্ভবত মুহিবের ইন্টারভিউ নেবেন। এই ভদ্রলোক কি প্রথম

ইন্টারভিউ-র সময় ছিলেন ? মুহিব মনে করতে পারছে না। মনে হয় ছিলেন না। থাকলে চেহারা মনে থাকত। ভদ্রলোক একাই মনে হয় ইন্টারভিউ নেবেন। প্রথম প্রশ্নটা কী হবে— আপনার নাম ? বেশির ভাগ সময়ই এই প্রশ্ন দিয়ে শুরু হয়। দ্বিতীয় প্রশ্ন— এই নামের অর্থ কী ? নামের অর্থ শুনে তিনি হাসাহাসি শুরু করবেন না তো ? এইবার নামের অর্থ জিজ্ঞেস করলে ভুল অর্থ বলতে হবে। নামের অর্থ 'প্রেমিক' না বলে সে বলবে 'সন্দেহকারী।'

মুহিবের সামনের ভদ্রলোক রিভলভিং চেয়ারে বসে আছেন। যারা রিভলভিং চেয়ারে বসে তারা সারাক্ষণই চেয়ার নিয়ে কিছু নড়াচড়া করে। এই ভদ্রলোক তা করছেন না। প্রশ্ন করবার সময় হয়তো করবেন। মুহিব প্রথম প্রশ্নের জন্যে অপেক্ষা করছে। ঘরটা বেশি ঠাণ্ডা। তার রীতিমতো শীত করছে। হয়তোবা বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। বাইরের আবহাওয়া ঠাণ্ডা হয়ে গেলে এসি বসানো ঘর বরফ শীতল হয়ে যায়। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে কি-না জানতে পারলে ভালো হতো। ঝুম বৃষ্টি হলে যেতে হবে নোরার কাছে। মুহিবের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে ইন্টারভিউ শেষ করে ঘর থেকে বের হয়েই সে দেখবে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে। রাস্তায় হাঁটু পানি। যদি সে-রকম হয় সে যে কাজটা করবে তা হলো— রিকশা নিয়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে চলে যাবে। সেখানে কদম ফুল বিক্রি হয়। নোরার জন্যে কিছু কদম ফুল কিনতে হবে। সিডি কিনতে হবে। সিডির নাম 'উড়ালপঙ্খি'। উড়ালপঙ্খি মানে কী ? যেই পাখি উড়ছে সেই পাখি ? তাহলে বসে আছে যে পাখি তারে কী বলা হবে ? বসালপঙ্খি ? মাই গড, মস্ত একটা ভুল হয়ে গেছে তো— মা'র জন্যে ডিভিডি ভাড়া করে আনা হয় নি। আজ রাতে বাসায় ফিরতে তার দেরি হবে। মা ছটফট করতে থাকবে ছবির জন্যে। ছবির নাম 'কয়লা'।

আপনার চোখে কী হয়েছে ?

মুহিব অন্য কিছু ভাবছিল বলেই হয়তো প্রশ্ন শুনে চমকে গেল। তার বুক ধড়ফড় করে উঠল। মনে হলো প্রশ্নটা খুবই কঠিন। এত কঠিন প্রশ্নের উত্তর সে দিতে পারবে না। তার চোখ যে ফুলে বন্ধ হয়ে আছে এটাও তার মনে ছিল না।

মুহিব হড়বড় করে বলল, স্যার, চোখে কী হয়েছে আমি জানি না। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি এই অবস্থা।

চোখ উঠে নি তো ?

বুঝতে পারছি না স্যার।

ভদ্রলোক রিভলভিং চেয়ার সামান্য ঘুরালেন। শান্ত গলায় বললেন— ১৯৭১ সনে সারা বাংলাদেশে চোখ উঠা রোগ হয়েছিল। এমন কোনো মানুষ ছিল না যার এই রোগ হয় নি। রোগটার নাম দেয়া হয়েছিল 'জয় বাংলা রোগ'। এমন

প্রায়ই হয়েছে— এই রোগে আক্রান্ত পাকিস্তানি মিলিটারিও চোখ লাল করে তাকিয়ে আছে, আবার যে মুক্তিযোদ্ধাকে সে গুলি করে মারার জন্যে ধরে নিয়ে এসেছে সেও চোখ লাল করে মিলিটারির দিকে তাকিয়ে আছে।

মুহিব চুপ করে আছে। এই গল্পটা শুনে তার কী রি-অ্যাকশন হওয়া উচিত সে বুঝতে পারছে না। সে কি হাসবে ? এটা কি হাসির গল্প ? মুহিব বলল— স্যার, আমার জন্ম ১৯৭১-এর পরে।

সেটা জানি, জন্ম তারিখ অ্যাপ্লিকেশন ফরমে লেখা আছে। আমি আপনার ফাইল পড়ে দেখলাম। Extracuriculam activitis-এর কলামে আপনি লিখেছেন— 'আমার কোনো প্রতিভা নেই। আমি প্রতিভাশূন্য মানুষ।' আপনার কি সত্যই ধারণা আপনার কোনো প্রতিভা নেই ?

জি স্যার। আমার নিজের এবং আমার বন্ধুবান্ধবদের আমার সম্পর্কে এই ধারণা।

একজন প্রতিভাশূন্য মানুষকে আমরা চাকরি দেব কী জন্যে ?

চাকরি করার জন্য প্রতিভার দরকার হয় না স্যার।

কীসের দরকার হয় ?

বুদ্ধির দরকার। আমার বুদ্ধি আছে। আমি পরিশ্রম করতে পারি।

বুদ্ধি আছে ?

জি স্যার আছে।

আমরা দু'জনকে রিক্রুট করেছি। একজন ছেলে একজন মেয়ে। আপনি দু'জনের মধ্যে একজন। কী কারণে আপনাকে রিক্রুট করা হয়েছে সেটা অনুমান করে বলুন। দেখি আপনার বুদ্ধি আছে কি-না।

মুহিব সহজ ভঙ্গিতে বলল, আমাকে চাকরি দেবার আলাদা কোনো কারণ নেই। আমার ধারণা আমাকে আপনারা নিয়েছেন কারণ আমার চেহারা সুন্দর।

আপনার ধারণা ঠিক আছে। আপনার বুদ্ধি ভালো। অফিসে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার হাতে হাতে নিয়ে যান। আগামী মাসের এক তারিখে চাকরিতে জয়েন করতে পারেন। Welcome to the Aarons.

ভদ্রলোক হ্যান্ডশেক করার জন্যে হাত বাড়িয়েছেন। মুহিবের ইচ্ছে করছে হেন্ডশেক না করে ভদ্রলোকের পা ছুঁয়ে সালাম করতে। সবচে' ভালো হয় সে যদি কার্পেটের উপর হামাগুড়ি দিয়ে ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে যায়। ভদ্রলোকের পায়ে কিছুক্ষণ মুখও ঘষা যেতে পারে। কুকুররা মনিবের কাছে গেলে কোলে উঠার জন্যে এরকম করে।

মুহিব ম্যানেজার সাহেবের ঘরে বসে আছে। এই ঘরের বড় বড় জানালা খোলা। পর্দা এক পাশে টেনে দেয়া। দোতলার এই ঘর থেকে আকাশ দেখা যাচ্ছে। রাস্তাঘাট দেখা যাচ্ছে। মুহিব জানালা থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। তার উচিত অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারের কথা ভুলে গিয়ে রাস্তায় নেমে পড়া। ভিজতে ভিজতে নোরাদের বাড়িতে চলে যাওয়া। কিছু কিছু বৃষ্টি আছে দেখলেই ভিজতে ইচ্ছা করে। এখন সেই ধরনের বৃষ্টি হচ্ছে। অথচ তাকে ম্যানেজার সাহেবের ঘরে বসে থাকতে হচ্ছে। তার সময় কাটছে না। ম্যানেজার ভদ্রলোক স্বল্পভাষী। একবার শুধু বললেন, আপনি কবে জয়েন করবেন ?

মুহিব বলল, জানি না।

ব্যস এই পর্যন্তই কথা। ম্যানেজার একজন বেয়ারাকে চোখের ইশারায় কী যেন বলল। সে মুহিবকে এক কাপ চা দিয়ে গেল। চা-টা খেতে ভালো। সুন্দর গন্ধ। এরকম চা পরপর দু'কাপ খেতে হয়। কিন্তু দ্বিতীয় কাপ চায়ের কথা তার বলতে ইচ্ছা করছে না। মুহিব ভেতরে ভেতরে টেনশন বোধ করছে। তার মনে হচ্ছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার হাতে পেতে পেতে বৃষ্টি থেমে যাবে। আকাশে অবশ্যি ঘনকালো মেঘ এখনো আছে। যেভাবে বৃষ্টি পড়ছে— আকাশের সব মেঘ ধুয়ে মুছে চলে যাবে। মুহিব চেয়ার ছেড়ে জানালার পাশে দাঁড়াল। আকাশের দক্ষিণ দিকটা নজর করে দেখতে হবে। দক্ষিণের সমুদ্র থেকে মেঘের সাপ্লাই যদি ঠিক থাকে তাহলে বৃষ্টি আরো ঘন্টা দুই থাকবে।

রাতে দেখা স্বপ্নটা মনে পড়েছে। তার মানে দুপুর হয়ে গেছে। রাতের স্বপ্ন তার সব সময় দুপুরে কেন মনে পড়ে ? ম্যানেজার সাহেবকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেবে ?

মুহিব সাহেব।

জি।

নিন— এইখানে সই করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা নিন। কনগ্রাচুলেশন্স।

মুহিব অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার হাতে নিল। অতিদ্রুত চোখ বুলালো। অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। বেসিক পে দশ হাজার টাকা। হাউজরেন্ট, মেডিকেল অ্যালাউন্স সব মিলিয়ে পনেরো হাজার ছয়শ'। প্রবেশনারি পিরিয়ড পার করলে রেগুলার পে-স্কেল শুরু হবে। রেগুলার পে-স্কেলটা কত ? প্রবেশনারি পিরিয়ডটাই বা কত দিনের ? মুহিব জানালা দিয়ে তাকাল। বৃষ্টি পড়া বন্ধ হয় নি। বরং বৃষ্টির জোর আরো বেড়েছে। মনে হচ্ছে পুরো ঢাকা শহর আজ বৃষ্টির পানিতে তলিয়ে যাবে।

নোরাদের বাড়ির গেটের দারোয়ানের নাম ইসকান্দর। নোরা এই নাম সংক্ষেপ করে নিয়েছে। সে ডাকে 'ইস'। ইসকান্দর থেকে ইস, কান্দর বাদ। নোরা যখন বলে, ইস ভাই, ছুটে চলে যান। খুব ঠাণ্ডা দেখে এক বোতল স্প্রাইট নিয়ে আসুন। গেট খোলা থাকুক। পাঁচ মিনিটের বেশি তো আপনার লাগবে না। এই পাঁচ মিনিটে ভয়ঙ্কর কিছু ঘটার সম্ভাবনা কম।— ইস ভাই নিতান্তই অনিচ্ছার সঙ্গে যায়। ইস ভাইয়ের বয়স ষাটের কাছাকাছি। দীর্ঘ ত্রিশ বছর সে নোরাদের বাড়ির গেটের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাটিয়েছে। গেট থেকে সামান্য দূরে গেলেই সে মনে হয় অস্থির বোধ করে। হয়তো নিজেকে সে গেটের অংশ বলেই এখন ভাবে।

তুমুল বৃষ্টির মধ্যেও ইসকান্দরকে দেখা গেল ছাতা মাথায় দিয়ে টুলের উপর বসে আছে। মুহিব গেটের ওপাশ থেকে আনন্দিত স্বরে বলল, ইস ভাইয়া, গেটটা খুলুন।

ইসকান্দর তাকাল। রাগী গলায় বলল, আমারে ইস ভাইয়া ডাকবেন না। আমার পিতামাতা আমার একটা নাম দিয়েছিল।

মুহিব বলল, সরি, আর ডাকব না। গেটটা খুলুন।

ইসকান্দর মুহিবের উপর থেকে মুখ ফিরিয়ে বলল, গেট খোলা যাবে না।

যাবে না কেন ?

আপা বাড়িতে নাই।

মুহিব পরিষ্কার বুঝতে পারছে এটা একটা মিথ্যা কথা। 'ইস ভাইয়া' ডাকায় দারোয়ান রেগে গেছে। দারোয়ানদের রাগের দৌড় গেট পর্যন্ত বলেই গেট খোলা হচ্ছে না। মুহিব বলল, ইসকান্দর শুনুন, আমি আপনার আপার কাছে এসেছি এটা আপনাকে কে বলল ? আমি নোরার বাবার সঙ্গে কথা বলার জন্যে এসেছি। উনি কি বাসায় আছেন ?

আছেন।

উনাকে খবর দিন।

মুহিবের ধারণা ছিল এই কথায় দারোয়ানের হুঁশ হবে। সে গেট খুলে দেবে। মিনমিনে গলায় বলবে, আপা বাসায় আছে। আমার ইয়াদ ছিল না। আসেন, ভিতরে আসেন। সে-রকম কিছু ঘটল না। দারোয়ান টুল ছেড়ে ভেতরের দিকে চলে গেল।

মুহিবের বুক ঈষৎ কেঁপে গেল। সত্যি কি নোরা বাড়িতে নেই ? দারোয়ান কি নোরার বাবাকে খবর দিতে গিয়েছে ? মুহিবের হাতে সাতটা দোলনচাঁপা। প্রবল বৃষ্টিতেও ধবধবে সাদা ফুলগুলির কিছু হয় নি। বরং সে নিজে চুপসে

গেছে। ঠাণ্ডায় শরীর কাঁপছে। আয়নার সামনে দাঁড়ালে হয়তো দেখা যাবে ঠাণ্ডায় এবং বৃষ্টির পানিতে তার ঠোঁট নীলচে হয়ে গেছে। নোরার সিডি কেনা হয় নি। প্রধান কারণ— টাকা ছিল না। সিডি না কেনায় ভালোই হয়েছে। এই বৃষ্টিতে সিডি বাঁচানোর কোনো উপায় থাকত না।

দারোয়ান ফিরে এসেছে। গেট খুলছে। তার চোখ-মুখ কঠিন হয়ে আছে। সে মুহিবের দিকে না তাকিয়েই বলল, আসেন। বড় সাহেব আপনাকে যেতে বলেছেন। মুহিব বলল, সে-কী!

নোরার বাবার সঙ্গে মুহিবের কখনো দেখা হয় নি। ভদ্রলোকের এমন অবস্থা যে বারো মাসের ভেতর তের মাসই থাকেন দেশের বাইরে। বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচির মতো অবস্থা। মাঝে মাঝে মেয়েকে ছবি পাঠান। ছবির পিছনে ছবি সম্পর্কে বর্ণনা থাকে। মুহিব এই ভদ্রলোককে প্রথম দেখে এরকম একটা ছবিতে। লম্বা ফর্সা এবং মাথাভর্তি আইনস্টাইনের মতো ঝাঁকড়া চুলের এক ভদ্রলোক কালো রঙের একটা পাথর হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। পাথরের দিকে তাকিয়ে আছেন মুগ্ধ দৃষ্টিতে। যেন এটা কোনো কালো পাথর না— এটা তাজমহল। বনসাই করে ছোট করা হয়েছে। ছবির উল্টা পিঠে ইংরেজিতে লেখা— মা নোরা, যে পাথর হাতে আমি দাঁড়িয়ে আছি এটা কোনো সাধারণ পাথর না। এটা একটা meteorite. অতি দূর কোনো নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে এটা পৃথিবীতে এসে পৌঁছেছে। ভালো থেকো...

নোরার বাবা নাজমুল করিম সাহেব মুহিবকে দেখে চিন্তিত গলায় বললেন, এ-কী! তোমার কী অবস্থা! কতক্ষণ ধরে বৃষ্টিতে ভিজছ? দাঁড়াও দাঁড়াও, আমি টাওয়েল নিয়ে আসি। আগে মাথাটা মুছ। ইসকান্দর আমাকে বলেছে তুমি নোরার বন্ধু। তোমার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করব। তার আগে ভেজা কাপড় বদলাও। একেবারে নতুন, ব্যবহার করা হয় নি এমন এক সেট কাপড় দিলে তোমার কি পরতে আপত্তি আছে?

মুহিবের খুব অদ্ভুত লাগছে। সে বসে আছে নোরার বাবার পাশে। তার গায়ে এই ভদ্রলোকের পায়জামা-পাঞ্জাবি। তাদের দু'জনের হাতে চায়ের কাপ।

তোমার নাম মুহিব?

জি স্যার।

স্যার বলছ কেন?

মুহিব হকচকিয়ে গেল। আসলেই তো, সে স্যার কেন বলছে? ইন্টারভিউ দিয়ে দিয়ে অভ্যাস হয়ে গেছে বলেই কি স্যার বলছে? না-কি এই ভদ্রলোককে তাদের কলেজের কোনো স্যারের মতো লাগছে? একজনের সঙ্গে অবশ্যি মিল

পাওয়া যাচ্ছে। আনন্দমোহন কলেজের ইতিহাসের স্যার, কুমুদ বাবু। ছাত্ররা সবাই তাকে ডাকত 'সেন্ট স্যার'। উনি গায়ে সেন্ট না মেখে বাসা থেকে বের হতেন না। পোশাকে-আশাকে ফিটফাট বাবু। ভদ্রলোক হঠাৎ পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করতেন। কাউকে চিনতে পারতেন না, তবে ছাত্রদের দেখলেই চিনতেন। গল্প করার জন্যে খুব আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে যেতেন। মুহিবের সঙ্গে একদিন দেখা। তিনি হাসি হাসি মুখে এগিয়ে এলেন। কোমল গলায় বললেন, তোমার নাম মুহিব না ?

মুহিব বলল, জি স্যার।

সেকেন্ড ইয়ার ?

জি স্যার।

রোল থার্টি থ্রি ?

জি স্যার।

দেখেছ, সব মনে আছে। পাগলদের কিছুই মনে থাকে না। আমার সবই মনে থাকে। ভালো আছ বাবা ?

জি স্যার।

তুমি আমাকে এক শিশি সেন্ট কিনে দিতে পারবে ? অন্য কোনো কিছুর অভাব বোধ করছি না। কাপড় ছাড়া ঘুরে বেড়াচ্ছি তাতেও তেমন অসুবিধা হচ্ছে না, তবে সেন্টের অভাবটা খুব বোধ করছি।

স্যার, আমি এক্ষুণি সেন্ট কিনে নিয়ে আসছি।

আমি তো সব সময় হাঁটাহাঁটির মধ্যে থাকি। আমাকে খুঁজে নাও পেতে পার। সেন্টটা কিনে তুমি আমার মা'র হাতে দিয়ে এসো। বাসা চিন তো ? বকুল গাছওয়ালা বাড়ি।

জি স্যার বাসা চিনি।

মুহিব সেদিনই সেন্ট কিনেছিল। দামি সেন্টই কিনেছিল। কুমুদ স্যারকে সেই সেন্ট দেয়া হয় নি। কারণ স্যারের মা পুরনো বাসায় ছিলেন না। উনি কোথায় গিয়েছেন কেউ বলতেও পারল না। সেন্টটা মুহিবের কাছে এখনো আছে।

নোরার বাবা বললেন, কী চিন্তা করছ ?

মুহিব চমকে উঠে বলল, কিছু চিন্তা করছি না।

তিনি হাসি হাসি মুখে বললেন, নোরা হঠাৎ করে বলল, ঝুম বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি নিয়ে লং ড্রাইভে গেলে খুব নাকি মজা হবে। তুমি আমার মেয়ের বন্ধু,

তার নেচার তো জানোই। যেই তার মাথায় চিন্তাটা এলো অমনি টেলিফোন করে বন্ধু-বান্ধব জোগাড় করল। মাইক্রোবাস নিয়ে বের হয়ে গেল। তোমাকে টেলিফোন করে নি ?

জি-না।

তোমার হাতের ফুলগুলি দোলনচাঁপা না ?

জি।

ইন্টারেস্টিং ব্যাপার কী জানো ? আমি আমার মেয়ের নাম দোলনচাঁপা রাখতে চেয়েছিলাম। মেয়ের মা বলল, দোলনচাঁপা শুনলেই কবি নজরুলের বইয়ের কথা মনে হবে। সঙ্গে সঙ্গে চোখে ভাসবে কবির ঝাঁকড়া চুলভর্তি ছবি। আমি ডাকব আমার মেয়েকে, চোখে ভাসবে কবি নজরুলের ছবি— তা হবে না। শেষে ডিসিশান পাল্টে ইবসেনের চরিত্রের নামে নাম রাখলাম— নোরা। নোরা নামটা তোমার কেমন লাগে ?

সুন্দর।

নোরা সুন্দর না-কি দোলনচাঁপা সুন্দর ?

দোলনচাঁপা সুন্দর।

নোরার আরেকটা খাস বাঙালি নাম আছে। সেটা জানো ? গানের ক্যাসেট বা সিডি যা বের হয় সেখানে তার বাংলা নামটা থাকে। জানো বাংলা নামটা ?

জি, চন্দ্রাবতী।

চন্দ্রাবতী নামের অর্থ জানো ?

জি-না।

চন্দ্রাবতী নামের অর্থ হলো চাঁদের সখী। নোরার একটা আরবি নামও আছে। আরবি নামটা আমার মা রেখেছিলেন— 'ওয়ামিয়া'। এই নামের অর্থ হলো বৃষ্টি। মানুষের স্বভাবের উপর নামের প্রভাব পড়ে— এই কথাটা মনে হয় সত্যি। বৃষ্টি নাম রাখার জন্যেই বোধহয় বৃষ্টি হলেই আমার মেয়ের মাথা খারাপের মতো হয়ে যায়।

মুহিবের ঝিমুনি ধরে গেছে। নোরার বাবারও মনে হচ্ছে কথা বেশি বলার অভ্যাস। তিনি ক্রমাগতই কথা বলে যাচ্ছেন। এখন আর তাঁর কথা মুহিব মন দিয়ে শুনছে না। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ঘর অন্ধকার। মুহিবের ধারণা কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ঘুমিয়ে পড়বে।

মুহিব।

জি।

তুমি কর কী ? পড়াশোনা ?

পড়াশোনা শেষ করেছি। আমি বেকার।

ও আচ্ছা।

মুহিবের মনে হলো সে নিজে ঘুমের মধ্যে কথা বলছে। সে বেকার না। তার পকেটে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার আছে। ভিজে ন্যাতন্যাতে হয়ে গেছে। তাতে কী। সে কি ভুলটা শুদ্ধ করবে ? বলবে যে এখন সে এরনস ইন্টারন্যাশনাল নামের মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে কাজ করে। থাক, দরকার কী।

মুহিব!

জি স্যার।

নোরার বন্ধুবান্ধদের আমি খুব পছন্দ করি। কেন জানো ?

জি-না।

পছন্দ করি কারণ বেশির ভাগ সময় আমি দেশের বাইরে থাকি। নোরাকে ঘিরে একগাদা বন্ধুবান্ধব আছে— এটা ভেবে নিশ্চিত বোধ করি। আমি কী বলার চেষ্টা করছি বুঝতে পারছ ?

জি পারছি।

তোমাদের বাসা কোথায় ?

ঝিকাতলা।

নিজেদের বাড়ি ?

আমার বড়চাচার বাড়ি। সবাই এক সঙ্গে থাকি।

ভালো তো। জয়েন্ট ফ্যামিলি উঠেই গেছে। বাবা-মা বেঁচে আছেন ?

জি।

শুনতেই তো ভালো লাগছে। পিতা-মাতা-পুত্র-কন্যা সব এক ছাদের নিচে।

মুহিব ঘুম ঘুম গলায় বলল, বাবা আমাদের সঙ্গে থাকেন না। আলাদা থাকেন।

কেন ?

উনাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। উনি এখন আর আমাদের পরিবারের সদস্য না।

বলতে বলতে মুহিব আরাম করে ঘুমিয়ে পড়ল।

মুহিবের বাবা শামসুদ্দিন সাহেব পল্লবীতে থাকেন। দুই কামরার ঘর, পেছনে বারান্দা আছে। টিনের ছাপড়া দিয়ে বারান্দা ঢাকা। সেখানেই রান্নার ব্যবস্থা। গ্যাসের কারবার নেই, রাঁধতে হয় কেরোসিনের চুলায়। সেটা শামসুদ্দিন সাহেবের জন্যে কোনো ব্যাপার না। তিনি একা মানুষ— বিশাল বাড়ি দিয়ে তিনি কী করবেন! তাঁর দরকার ঘুমাবার জন্যে একটা জায়গা। মাথার উপর ফ্যান। (তিনি গরম একেবারেই সহ্য করতে পারেন না। শীতের সময়ও ফ্যান ছেড়ে রাখতে হয়।)

তাঁর জন্যে সবচে' সুবিধা হতো যদি এক কামরার একটা ঘর হতো। ঘরের এক কোনায় রান্নার ব্যবস্থা থাকবে। টুক করে পানি গরম করে এক কাপ চা খেয়ে ফেলা। এক মুঠ চাল এক মুঠ ডাল দিয়ে খিচুড়ি। রান্নার শেষ পর্যায়ে চায়ের চামচে এক চামচ ঘি। ব্যস ফুরিয়ে গেল।

এক কামরার একটা ঘরই তার জন্যে যথেষ্ট ছিল। এখন যে বাড়িতে আছেন সেটাও খারাপ না। ফ্ল্যাট বাড়ি না। আলাদা বাড়ি। মাথার উপর টিনের ছাদ। রাতে টিনের চালে যখন বৃষ্টি হয় অদ্ভুত ভালো লাগে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই বাড়িতে থাকতে পারলে খারাপ হতো না। সেটা সম্ভব হচ্ছে না। বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। খুপড়ি খুপড়ি টিনের বাড়ি সব উঠে যাচ্ছে। বিশাল অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স হবে। লিফট থাকবে। আলাদা জেনারেটর থাকবে। সব ভাড়াটেদের বাড়ি ছাড়ার নোটিশ দেয়া হয়েছে। বাড়ি ছাড়ার শেষ সময়ও পার হয়ে গেছে। বেশির ভাগই চলে গেছে। শামসুদ্দিন সাহেব যেতে পারেন নি। তিনি বাড়ি খুঁজে পাচ্ছেন না। বৃদ্ধদের কেউ বাড়ি ভাড়া দিতে চায় না। বাড়িওয়ালা চোখ বড় বড় করে বলে, একা থাকবেন ? আপনার ফ্যামিলি মেম্বাররা কোথায় ?

তারা ঢাকায়। তাদের সাথে আমার ঠিক অ্যাডজাস্টমেন্ট হয় না বলে আমি আলাদা থাকি।

অ্যাডজাস্টমেন্ট হয় না কেন ?

শামসুদ্দিন সাহেব ধাঁধায় পড়ে যান। কী জবাব দেবেন বুঝতে পারেন না। অ্যাডজাস্টমেন্ট কেন হয় না— এটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। এটা নিয়ে বাড়িওয়ালার সঙ্গে আলাপ করার কিছু নেই। ব্যাপারটা পুরোপুরি ব্যাখ্যা না করলে বাড়ি পাওয়াও যাবে না। বাড়িওয়ালাকে সন্তুষ্ট করতে হবে।

আপনি করেন কী ? মানে আপনার সোর্স অব ইনকাম কী ?

কোচিং সেন্টারে পড়াই।

কী পড়ান ?

ইংরেজি পড়াই। আমি একটা বেসরকারি কলেজের ইংরেজির শিক্ষক ছিলাম। রিটায়ার করেছি।

আপনি যে একা থাকবেন অসুখ-বিসুখ হলে আপনাকে দেখবে কে ?

মেজাজ খারাপ হবার মতো প্রশ্ন। আমাকে কে দেখবে সেটা আমার ব্যাপার। তোমার মাসে মাসে ভাড়া পেলেই তো হলো।

বাড়িওয়ালাকে এই ধরনের কথা বলা যায় না। বাড়ি ভাড়া নেবার আগে বাড়িওয়ালার মন জুগিয়ে কথা বলতে হয়। স্রোতের পাংগাশ হতে হয়। স্রোত যেদিকে পাংগাশ মাছ সেদিকে। বাড়িওয়ালা স্রোত, ভাড়াটে পাংগাশ।

শামসুদ্দিন সাহেব যথেষ্টই ঝামেলায় পড়েছেন। কেউ তাকে বাড়ি ভাড়া দেবে— এরকম মনে হচ্ছে না। শেষপর্যন্ত হয়তো সস্তা ধরনের কোনো হোটেলে মাসকাবারি বন্দোবস্তে যেতে হবে। এটাও খারাপ না। হোটেলে থাকা মানেই লোকজনের মধ্যে থাকা। বয়-বাবুর্চির আনাগোনার মধ্যে থাকা। কোথাও টেলিফোনের দরকার পড়ল— ম্যানেজারের অফিস থেকে টেলিফোন। শরীরও এখন ভালো যাচ্ছে না। কথা নেই বার্তা নেই হুট করে রাতদুপুরে একশ দুই একশ তিন জ্বর। এ ধরনের পরিস্থিতিতে বয়কে খবর দিলে মাথায় এসে পানি ঢালবে। পাঁচ-দশ টাকা বকশিশ ধরিয়ে দিলেই হলো।

তিনি হোটেল খোঁজা এখনো শুরু করেন নি। রোজই ভাবেন আগামীকাল থেকে শুরু হবে। ইত্তেফাক পত্রিকায় ছয়শ টাকা খরচ করে একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। তাতে কিছু হয় কি-না সেটা দেখে জোরেসোরে হোটেলে ঘর খোঁজা শুরু করবেন। ইত্তেফাকের বিজ্ঞাপনটা এরকম—

লজিং চাই

ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক।
থাকা-খাওয়ার বিনিময়ে লজিং চাই।

এখনো কোনো জবাব আসে নি। ঢাকা শহরের লোকজন ছেলেমেয়েদের প্রাইভেট পড়ানোর ব্যাপারে আগ্রহী, তবে ঘরে টিচার রাখতে আগ্রহী না। ঘরে লজিং রাখার ব্যাপার মনে হয় ঢাকা শহরের লোকজন ভুলে গেছে। লজিং শব্দটা এসেছে Lodge থেকে।

তাড়াতাড়ি কোনো একটা লজিং-এর ব্যবস্থা হলে ভালো হয়। কারণ কোচিং সেন্টারে কিছু সমস্যা হয়েছে। কোচিং সেন্টারের মালিক চেংড়া এক ছেলে মাসখানেক আগে তাকে ডেকে নিয়ে মুখ-চোখ কুঁচকে বলল— শামসুদ্দিন সাহেব, আপনি দাড়ি রেখেছেন কেন ? এখন তো আপনাকে দেখে মনে হয় মাদ্রাসার শিক্ষক। ছাত্রদের পড়াবেন ইংরেজি, গেটাপে স্মার্টনেস থাকবে। মুখভর্তি যদি মওলানার মতো দাড়ি থাকে তাহলে চলবে কীভাবে ? আজ দাড়ি রেখেছেন, পড়শু থেকে ধরবেন লম্বা আচকান। তারপর চোখে দেবেন সুরমা। কয়েক দিন পরে মাথায় বেতের গোলটুপি। ভাই, আমরা তো ব্যবসা করতে এসেছি। আমাদের 'শো-শা' থাকতে হবে। থাকতে হবে না ?

শামসুদ্দিন বললেন, জি থাকতে হবে।

ব্যক্তিগতভাবে আপনি যত ইচ্ছা ধর্মকর্ম করেন। আমার কোনো সমস্যা নাই। আমি নিজে পাঁচওয়াক্ত নামাজ পড়ার চেষ্টা করি। দু'বছর আগে ওমরা হজ করে এসেছি। বুঝতে পারছেন কী বলার চেষ্টা করছি ?

কিছু না বুঝেই শামসুদ্দিন সাহেব বললেন, জি বুঝতে পারছি।

আপনার বয়সও হয়েছে। আপনি লোডও ঠিকমতো নিতে পারছেন না। আমার দরকার অ্যানার্জেটিক লোক। বুঝতে পারছেন ?

জি বুঝতে পারছি।

আপনার টিচিং অ্যাবিলিটি নিয়ে আমার কোনো কমপ্লেইন নেই। আমি শুনেছি আপনি ভালো শিক্ষক। কিন্তু বয়সের ব্যাপারটা মাথার মধ্যে রাখতে হবে।

শামসুদ্দিন সাহেব বেশ কয়েকবার মাথা নেড়ে বলেছেন, জি জি।

এইসব লক্ষণ ভালো লক্ষণ না। তাঁর ধারণা তিনি যে-কোনো একদিন শুনবেন— তাঁর চাকরি শেষ। তখন ভালো ঝামেলায় পড়ে যেতে হবে। কী ঝামেলা সে সব নিয়ে আগে-ভাগে চিন্তা করতে ভালো লাগে না। রাতে ঘুম ভেঙে গেলে তিনি খুব চেষ্টা করেন সমস্যা নিয়ে চিন্তা না করতে। খুবই আশ্চর্যের কথা— তিনি এ ব্যাপারে সফল। ঘন্টার পর ঘন্টা তিনি জেগে থাকেন। মাথায় কোনো চিন্তা নেই। ফাঁকা মাথা। যখন বৃষ্টি হচ্ছে বৃষ্টির শব্দ শুনছেন। Oxford

ডিকশনারিতে Lodge শব্দ সম্পর্কে বলা হয়েছে— A small house in a country where people stay when they want to take part in some types of out door sport.

গত রাতে শামসুদ্দিন সাহেবের ঘুম ভালো হয় নি। শরীর খুব খারাপ লাগছিল বলে ন'টা বাজার আগেই শুয়ে পড়েছিলেন। রাত এগারোটার দিকে ঝুম বৃষ্টির শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। তারপর আর ঘুম আসে না। মাথায় যন্ত্রণা। বমি বমি ভাব। শরীরে ব্যথা। বিছানায় শুয়ে আরাম পাচ্ছেন না। কাত হয়ে শুলে মনে হয় চিৎ হয়ে থাকলে ভালো লাগত। চিৎ হয়ে থাকলে মনে হয় আগে যেভাবে শুয়েছিলেন সেটাই ভালো ছিল। কপালে হাত দিয়ে কোনো জ্বর টের পাওয়া যাচ্ছে না। তারপরেও কৌতূহলবশত থার্মোমিটার দিয়ে জ্বর দেখলেন। একশ দুই-এর সামান্য বেশি। শিশু এবং বৃদ্ধদের জন্যে একশ দুই খুব বেশি জ্বর না। একশ তিনের উপর উঠলে মাথায় পানি ঢালার চিন্তা করতে হয়। তাঁর জ্বর যদি আরো বাড়ে তাহলে বাথরুমে ঢুকে কল ছেড়ে বসে থাকলেই হবে।

'মানুষের সকল অবস্থার জন্যে তৈরি থাকতে হয়'— এই ধরনের উচ্চ শ্রেণীর ভাব চিন্তা করে তিনি সময় কাটাতে লাগলেন। মাঝে মাঝে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে, তখন মনে হচ্ছে তিনি মহিষের গাড়িতে শুয়ে আছেন। গাড়ি একবার এদিক হেলে যাচ্ছে, আরেকবার ওদিক হেলছে। মহিষের গায়ের বোটকা গন্ধও তখন নাকে লাগছে।

শেষ রাতে জ্বর আরো বাড়ল। থার্মোমিটারে পারদ তিনের ঘর ছাড়িয়েও কিছু দূর উঠে গেল। তিনি বুঝতে পারছেন তাঁর উচিত বাথরুমে ঢুকে কল ছেড়ে দেয়া। কিন্তু বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ানোর মতো শারীরিক জোরও তিনি পাচ্ছেন না। তিনি জেগে আছেন। জাগ্রত অবস্থাতেই তাঁর মনে হচ্ছে, মহিষের গাড়িতে শুকনা খড়ের বিছানায় তিনি শুয়ে আছেন। খানাখন্দে পড়ে গাড়িও ঝাঁকাচ্ছে। তিনি সারা শরীরে সেই ঝাঁকুনি অনুভব করছেন।

সকাল এগারোটার দিকে মুহিব তার বাবাকে দেখতে এলো। বাড়ির চারপাশে পানি থই-থই করছে। আরেকটু পানি বাড়লেই ঘরে পানি ঢুকে যাবে। পানি ভেঙে ঘরে ঢুকতে গিয়ে প্যান্ট-জুতা কাদায় মাখামাখি।

শামসুদ্দিন সাহেব ছেলের দিকে তাকিয়ে আনন্দিত গলায় বললেন, বাথরুমে ঢুকে সাবান ডলা দিয়ে পা ধুয়ে ফেল। তাকের উপর সাবান আছে। ভেজা প্যান্ট খুলে একটা লুঙ্গি পরে নে। আমার ধোয়া লুঙ্গি আছে।

মুহিব বলল, বাবা তোমার শরীর খারাপ ?

রাতে সামান্য জ্বরের মতো এসেছিল— এখন শরীর ফিট। হালকা ফুরফুরে লাগছে।

কিছুক্ষণ আগেই তাঁর খুবই খারাপ লাগছিল। বিছানা থেকে নামতে ইচ্ছা করছিল না। ছেলেকে দেখার পর থেকে সত্যি সত্যি ভালো লাগছে। মাথায় চাপ দিয়ে যে যন্ত্রণাটা বসে ছিল সেটাও নেই। শরীরে এখন সত্যি সত্যি ফুরফুরে ভাব চলে এসেছে। ছেলের সঙ্গে মুখোমুখি বসে গল্প করবেন ভাবতেই ভালো লাগছে। ভালো লাগাটা এত তীব্র যে বুকে সামান্য ব্যথা বোধও করছেন। তাঁর এই ছেলেটা মাঝে-মধ্যে তাকে দেখতে আসে। সহজ-স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথা-বার্তা বলে। ছেলেটা যখন আসে তখন তাঁর মনে হয়— বেঁচে থাকা যথেষ্টই আনন্দের ব্যাপার। এবং তাঁর নিজের জীবনে কোনোই সমস্যা নেই। কোনো একটা কাজে সংসারের বাইরে বাস করছেন। কাজ শেষ হলেই সংসারে ফিরবেন।

মুহিব, নাশতা খেয়ে এসেছিস ?

মুহিব বাথরুম থেকে বলল, হুঁ।

চা খাবি ? চা বানাব ?

হুঁ।

বাড়ির খবর সব ভালো তো ?

হুঁ।

শামসুদ্দিন সাহেব হেসে ফেললেন। হুঁ হুঁ করে কথা বলা মুহিবের শৈশবের অভ্যাস। এক দেড় বছর বয়সে বাচ্চারা কথা বলা শেখে। একবার বলা শুরু করলে অতি দ্রুত লম্বা লম্বা বাক্য তৈরি শুরু হয়। মুহিবের বেলায় উল্টাটা হয়েছিল। দেড় বছর বয়স পর্যন্ত সে শুধু হুঁ বলত। আর কিছু না, শুধুই হুঁ।

কেমন আছ গো বাবা ?

হুঁ।

পানি খাবে ?

হুঁ।

নাম কী তোমার বাবা ?

হুঁ।

ওরে সোনা, হুঁ ছাড়া তুমি আর কিছু বলতে পার না ?

হুঁ।

শামসুদ্দিন তাঁর ছোট ছেলের নাম দিয়েছিলেন— হুঁ বাবা। শৈশবের অনেক অভ্যাসের মতো হুঁ বলা অভ্যাস মুহিবের বেলা স্থায়ী হয় নি। তবে শামসুদ্দিন লক্ষ করেছেন, মুহিব যখন অন্যমনস্ক থাকে তখন তার হুঁ বলা অভ্যাস ফিরে আসে। তখন যে প্রশ্নই করেন মুহিব জবাব দেয় হুঁ দিয়ে।

মুহিব তোর চাকরি-বাকরির কিছু হয়েছে ?

মুহিব জবাব দিল না। শামসুদ্দিন বাথরুম থেকে পানি ঢালার শব্দ পেলেন। তাঁর মন সামান্য খারাপ হলো। ছেলেকে এই প্রশ্ন করা ঠিক হয় নি। চাকরি পেলে সে নিজেই এসে হাসি মুখে বলত। বেচারার সমস্যার সমাধান কিছু হচ্ছে না। এই সময়ে সমস্যার কথা মনে করিয়ে দেয়া অন্যায় একটা কাজ। তিনি সব সময় ভাবেন— এই কাজ কখনো করবেন না। চাকরির কথা জিজ্ঞেস করে ছেলেকে লজ্জা দেবেন না। অথচ প্রতিবারই প্রশ্নটা করেন।

মুহিব বাথরুম থেকে বের হয়েছে। সে যে শুধু হাত-পা ধুয়েছে তা না, মাথায়ও পানি দিয়েছে। চুল বেয়ে পানি পড়ছে। শামসুদ্দিন ছেলের দিকে তাকিয়ে খুশি খুশি গলায় বললেন, কাছে আয় মাথা মুছিয়ে দেই। মুহিব আপত্তি করল না। বাবার কাছে এগিয়ে গেল। শামসুদ্দিন নিচু গলায় বললেন, চাকরি হচ্ছে কি হচ্ছে না— এই নিয়ে চিন্তা করে মাথা খারাপ করবি না। যখন হবার হবে। ভাগ্যে যা থাকার তাই হয়।

মুহিব বলল, তুমি কি নতুন বাড়ি খুঁজে পেয়েছ ? এই বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে বলেছিলে।

শামসুদ্দিন সাহেবের আবার খানিকটা মন খারাপ হলো। ছেলে তাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করছে। বেচারার নিজের ঝামেলারই কোনো পারাপার নেই, তাকে ভাবতে হচ্ছে অন্যের ঝামেলা নিয়ে।

শামসুদ্দিন সাহেব মিথ্যা করে বললেন, এখনো খোঁজা শুরু করি নাই। তাছাড়া লোকজনদের বলা আছে। খুঁজতেও হবে না। তাছাড়া আমি একা মানুষ, আমার কিছু লাগবেও না। একা মানুষের জন্যে কিছু লাগে না। কথায় আছে—

ভোজনং যত্রতত্র
শয়নং হট্ট মসজিদ।

মুহিব বলল, কথাটা হবে হট্ট মন্দির। তুমি মসজিদ বলছ কেন ?

এখানে মন্দির পাব কোথায়। আর যদি পাইও ওরা কি মন্দিরে আমাকে ঘুমাতে দিবে?

তুমি কি আজকাল ধর্ম-কর্ম করছ ?

দাড়ি দেখে বলছিস ? ফজর আর মাগরেবের নামাজটা পড়ার চেষ্টা করি।

মুহিব হঠাৎ বলে বসল, বাবা, তুমি কি খুব কষ্টে আছ ?

কথাটা মুহিব খুব স্বাভাবিকভাবে বলল, কিন্তু শামসুদ্দিনের চোখে সঙ্গে সঙ্গে পানি এসে গেল। গলা ভারী হয়ে গেল। তিনি অবহেলার একটা ভাব চোখেমুখে এনে বললেন, কষ্টে আছি তোকে কে বলল ? সুখে আছি বুঝলি। সংসারের টেনশন মাথায় নাই। রাতে যখন ইচ্ছা শুয়ে পড়লাম, আবার ইচ্ছা করল সারা রাত বসে রইলাম। কারো কিছু বলার নেই। Freedom-এর আনন্দের কাছে সব আনন্দ তুচ্ছ। এই বিষয়ে কোলরিজের একটা বিখ্যাত বাক্য আছে। মনে পড়লেই তোকে বলব। আজকাল স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে গেছে।

মুহিব ফট করে বলে বসল, বাবা, যমুনা মেয়েটা কোথায় ? যার জন্যে তুমি আমাদের সবাইকে ফেলে রেখে চলে এলে। যে মেয়ের জন্যে তুমি এতটা করলে সে তোমাকে এই অবস্থায় রেখে চলে গেল কেন ?

শামসুদ্দিন খুবই বিব্রত বোধ করছেন। ছোটবেলায় মুহিবের অভ্যাস ছিল বাবার বুকের উপর শুয়ে ঘুমানো। সেই ছেলে এমন কঠিন প্রশ্ন করছে!

মুহিব বলল, তোমার জবাব দিতে ইচ্ছা না হলে জবাব দিও না। চা বানাও চা খাই।

শামসুদ্দিন চা বানালেন। ঘরে দুধ নেই, লিকার চা। তিনি ছেলের দিকে তাকিয়ে খুশি খুশি গলায় বললেন, আদা-চা বানিয়ে দিলাম। খেয়ে দেখ, শরীর ঝরঝরে হয়ে যাবে। কোরান শরীফে আদার রেফারেন্স আছে এটা জানিস ?

না।

আল্লাহপাক বলেছেন, বেহেশতে তোমাকে দেয়া হবে আদা মিশ্রিত পানীয়। আল্লাহপাক আদা-চায়ের কথাই বলেছেন কি-না কে জানে।

বাবা, তোমার শরীর কিন্তু খুবই খারাপ করেছে। চোখ ফুলে গেছে। হাত-পা ফুলে গেছে। শরীরে মনে হয় পানি এসেছে।

বুড়ো বয়সে শরীরে পানি তো আসবেই। আমার তো তাও কম এসেছে। অনেকের এমন পানি আসে যে শরীরেই জোয়ার-ভাটা হয়। হা হা হা হা।

মুহিব তাকিয়ে আছে। শামসুদ্দিন সাহেব হেসেই যাচ্ছেন। অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে বললেন, তোর বন্ধু-বান্ধবরা কেমন আছে ?

কোন বন্ধুরা ?

ঐ যে কিছু বেকার বন্ধুরা ক্লাবের মতো কী যেন করেছিস।

ক্লাব-টাব কিছু না। মাঝে মাঝে এক সঙ্গে বসা হয়।

ওরা আছে কেমন ?

ভালো।

একজনকে নিয়ে এসেছিলি, সফিক নাম।

জি।

সফিক ভালো আছে ?

জি, ভালো আছে।

অসাধারণ ছেলে। এমন ভালো ছেলে আমি আমার জীবনে দেখি নি।

কোন অর্থে ভালো ছেলে ?

সব অর্থে। তাকে একবার কথায় কথায় বলেছিলাম, ঢাকা শহরে ভালো ঘি পাওয়া যায় না। সবই ভেজাল। সে বলল, চাচাজি, আমি শেরপুর থেকে আসল সরে ভাজা ঘি এনে দেব। এই ধরনের কথার কথা তো সবাই বলে। কয়জন আর মনে রাখে! সফিক কিন্তু ঠিকই মনে রেখেছে। এক কেজি ঘি এনে দিয়েছে— যেমন ঘ্রাণ, খেতেও তেমন সুস্বাদু। এখনো আছে। এক চামচ খাবি ?

শুধু শুধু ঘি খাব কেন ?

শুধু শুধু খাওয়া যায়। মাঝে মাঝে শরীর ভালো থাকে না। রান্নাবান্না করতে ইচ্ছা করে না। আমি করি কী, দুই চামচ ঘি আর দুই গ্লাস পানি খেয়ে শুয়ে পড়ি। দেব তোকে এক চামচ ? লবণের ছিটা দিয়ে খেয়ে দেখ। অবশ্যই ভালো লাগবে। দেব ?

মুহিব বলল, দাও।

মুহিব ঘণ্টাখানেক সময় কাটিয়ে ঘর থেকে বের হলো।

শামসুদ্দিন সাহেব ছেলেকে এগিয়ে দিতে গেলেন। নিজেই রিকশা ঠিক করলেন। দরদাম করে ভাড়া কমিয়ে ভাড়া দিয়ে দিলেন। রিকশা যখন চলতে শুরু করল তখন হঠাৎ বললেন, মুহিব দাঁড়া। তোর সঙ্গে রিকশায় করে কিছু দূর যাই। এ জার্নি বাই রিকশা। আমার খারাপ লাগে না। হাওয়া খেতে খেতে যাওয়া। শহরের বিষাক্ত হাওয়া— এইটাই যা সমস্যা।

রিকশা চলছে। শামসুদ্দিন ছেলের পাশে বসে আছেন। এক সময় ইতস্তত করে বললেন, তোর কি সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস আছে ?

মুহিব বলল, না।

শামসুদ্দিন সাহেব বললেন, যদি অভ্যাস থাকে তাহলে আমাকে লজ্জা করিস না। একটা বয়সের পর পুত্র হলো মিত্র বদাচারেৎ অর্থাৎ মিত্র। তোর বন্ধুরা তোর কাছে যেমন, আমিও সে-রকম। বুঝতে পারছিস ?

হুঁ।

তোর বন্ধু সফিকের সঙ্গে তোর কি আজ দেখা হবে ?

হুঁ।

দেখা হলে অবশ্যই বলবি তার দেয়া ঘি আমি খুব আরাম করে খেয়েছি। বলতে পারবি না ?

হুঁ।

সফিকের মতো ছেলে বন্ধু হিসাবে পাওয়া ভাগ্যের কথা।

হুঁ।

আসলে বন্ধু পাওয়াই ভাগ্যের ব্যাপার। বন্ধুত্বের বিষয়ে কবি ইয়েটস-এর কিছু লাইন আছে অসাধারণ—

> Think where man's glory most begins and ends
> And say, my glory was I had such friends.

লাইন দু'টা সুন্দর না ?

হুঁ।

মুখস্থ করে ফেল। মুখস্থ করে ফেললে সময়ে অসময়ে বলতে পারবি। আরেকবার বলি ?

> Think where man's glory most begins and ends
> And say, my glory was I had such friends.

মিরপুর দু'নম্বরের চারতলা ফ্ল্যাট বাড়ির ডানদিকের ফ্ল্যাটটায় (D4, দরজার পাশে টবে কামিনী ফুলের বড় একটা গাছ।) সফিক গত এক সপ্তাহ ধরে বাস করছে। ফ্ল্যাটের মালিক সফিকের মেজো মামা আব্দুল গফুর। তিনি স্বপরিবারে আজমীর শরিফে গিয়েছেন খাজা বাবার দোয়া নিতে। বিয়ের পনেরো বছর পরেও ছেলেমেয়ে হচ্ছে না। খাজা বাবার দরবার শরিফ থেকে স্বামী-স্ত্রী হাতে সুতা বেঁধে আসবেন। সুতা বাঁধার পর ইন্ডিয়াতে ঘুরবেন। তাজমহল-টাজমহল দেখবেন। তাদের এক মাসের পরিকল্পনা। সফিকের দায়িত্ব হলো, সে এক মাস বাড়ির দেখাশোনা করবে। কামিনী ফুলের গাছে পানি দেবে। ভেতরের বারান্দায় টবে পাঁচটা গোলাপ গাছ লাগানো হয়েছে। গোলাপ গাছে কলি দেখা দিলেই কাঁচি দিয়ে কলি কেটে ফেলবে। এতে নাকি পরবর্তীতে ফুল অনেক বড় হবে। আব্দুল গফুর সাহেব সফিকের হাতে বসার ঘর এবং রান্নাঘরের চাবি দিয়ে গেছেন। বাকি ঘরগুলি তালাবন্ধ করে গেছেন। সফিককে তিনি হাতখরচ হিসেবে এক হাজার টাকাও দিয়ে গেছেন। সফিক খুবই বিব্রত গলায় বলেছে—ছিঃ ছিঃ মামা, টাকা দিতে হবে কেন ? অসম্ভব, টাকা তুমি রাখো তো।

সফিকের মামা বলেছেন, বেকার মানুষ, তোর টাকা লাগবে না ? পকেটখরচ হিসেবে রেখে দে। আর শোন, চব্বিশ ঘণ্টা বাড়িতে থাকতে হবে তা-না। রাতে গিয়ে শুধু ঘুমালেই হবে। সোফাতে শুয়ে থাকবি। ফুল স্পিডে ফ্যান ছেড়ে দিলে মশা ধরবে না। মশার কয়েল জ্বালাবি না। নতুন কার্পেট কিনেছি। কার্পেট পুড়ে-টুরে যেতে পারে।

মশা কামড়ে খেয়ে ফেললেও আমি মশার কয়েল ধরাব না। কয়েলের গন্ধে আমার মাথা ধরে যায়।

রান্নাঘরে ঢুকে রান্নাবান্নার চেষ্টা যেন আবার করিস না। বেসিন নোংরা করে রাখবি, তোর মামি রাগ করবে।

আমি খাওয়া-দাওয়া করেই বাড়িতে ঢুকব। তুমি মোটেই চিন্তা করবে না।

বন্ধু-বান্ধব জমিয়ে আড্ডা দিস না যেন।

আরে না। রাত আটটা সাড়ে আটটার দিকে টুক করে বাড়িতে ঢুকব। ভোরবেলা বের হয়ে আসব। বন্ধু-বান্ধবকে এই বাসার খবরই দেব না। সিগারেট খেয়ে তারা যেখানে-সেখানে ছাই ফেলবে। দরকার কী!

বের হয়ে আসার সময় ভালোমতো তালা দিবি। তালা লাগাবার পর ভালোমতো টেনে টেনে দেখবি ঠিকমতো লাগল কি-না।

অবশ্যই।

ফুলগাছে পানি ঠিকমতো দিবি। গোলাপ গাছগুলিতে একদিন পর পর। কামিনী গাছে রোজ দিতে হবে। আজমীরে যাচ্ছি, তোর জন্যেও দোয়া করব। খাজাবাবার কাছ থেকে খালি হাতে কেউ ফিরে না। দেখবি বছর না ঘুরতেই চাকরি হবে ইনশাল্লাহ।

দুই-তিন গজ সুতা নিয়ে এসো। নিজে পরব, বন্ধু-বান্ধবকে দেব।

প্রথম দিনেই সন্ধ্যার পর থেকে সফিকের বন্ধু-বান্ধবরা জড়ো হতে শুরু করল। সফিক মাত্র দু'জনকে খবর দিয়েছিল। সেই দু'জন বাকিদের খবর দিয়েছে। রাত ন'টার মধ্যে সফিকের আট বন্ধু এসে উপস্থিত হয়ে গেল।

বসার ঘর ছোট। আটজনের আরাম করে বসা সম্ভব না। সোফা বের করে বারান্দায় নিয়ে যাওয়া হলো। এখন কার্পেটের উপর আরাম করে পা ছড়িয়ে বসে আড্ডা দেয়া যায়। সফিক বলল, রাত এগারোটার মধ্যে আড্ডা শেষ। এগারোটা বাজার এক মিনিট পরে যেন আমি কাউকে দেখতে না পাই। এটা কোনো অনুরোধ না। আদেশ। আরেকটা কথা— এখানে যতক্ষণ থাকবি ফিসফিস করে কথা বলবি। কথার শব্দ যেন এক দেড় ফুটের বাইরে না যায়।

সফিকের অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ইয়াকুব বলল, ফিসফিস করে কথা বলতে হবে কেন?

এটা ফ্ল্যাটবাড়ি, এখানে হৈচৈ করা যাবে না। ঘটনা ঘটানো যাবে না।

ইয়াকুব অবাক হয়ে বলল, এখনো তো কোনো ঘটনাই ঘটে নি। তুই রেগে যাচ্ছিস কেন?

সফিক বলল, ঘটনা ঘটে নি কিন্তু তোরা ঘটনা ঘটাবি— এই জন্যে এডভান্স রেগে যাচ্ছি।

ইয়াকুব বলল, জগতের নিয়ম হলো প্রথমে Cause তারপর Effect. তোর তো দেখি উল্টা, প্রথমে Effect তারপর Cause। ঠিক আছে, এত চেতাচেতির দরকার নাই। আমরা চলে যাই।

চলে যা, কাউকে আমি পায়ে ধরে সেধে আনি নি।

ইয়াকুব বলল, তুই বরং এক কাজ কর, তিনটা সিডাকসিন ট্যাবলেট খেয়ে ঝিম ধরে সোফায় শুয়ে থাক। আমরা আড্ডা দেই। মামা হিল্লি-দিল্লি করে বেড়াচ্ছে। তাঁর ভয়ে তুই কেঁচোরও অধম হয়ে গেলি। তোর সামনে এখন কেঁচোও আলেকজান্ডার দি গ্রেট।

বক্তৃতা দিবি না।

আমরা থাকব, না চলে যাব— স্ট্রেইট বল। হাংকি পাংকি না।

চলে যেতে বলেছি ?

ভাব বাচ্যে কথা বলবি না। হয় 'ইয়েস' কিংবা 'নো'।

তোদের থাকতে ইচ্ছা হলে থাকবি। চলে যেতে চাইলে চলে যাবি।

এত কথার দরকার নাই— চলে যাচ্ছি।

ঠিক আছে, যা চলে যা।

রাত এগারোটার সময় দেখা গেল কেউই যায় নি। বরং আরো দু'জন এসে যুক্ত হয়েছে। সফিককে সবচে' আনন্দিত মনে হচ্ছে। সে চোখ বন্ধ করে তার অতি প্রিয় সঙ্গীত গাইছে— 'আমরা পুতুলওয়ালা, পুতুল বেচে যাই...।' সফিকের গানের গলা নেই। কেউ গান গাইলে সে বিরক্ত হয়। কিন্তু নিজে গভীর আবেগে ভুল তালে ভুল সুরে 'পুতুলওয়ালা' গান গায়। তখন কেউ যদি কোরাসে অংশ নেয় সে অত্যন্ত আনন্দিত হয়। তাকে আনন্দ দেয়ার জন্যে অনেকেই তার সঙ্গে গলা মেলায়।

বড় একটা কাচের গ্লাসে বিশেষ এক ধরনের শরবত বানানো হয়েছে। তার রঙ ঘন কালো। বিশেষ ধরনের শরবত প্রস্তুতের কাজটা সবসময় করে মহসিন। জিনিসটা বানানো হয় গোপনে। তাতে কী কী মিশানো হয় তাও গোপন। অতি সামান্য জিনিস দিয়েও মহসিন অসামান্য জিনিস বানিয়ে ফেলতে পারে। খেতে স্বাদু হয়। তারচে' বড় কথা অতি অল্পতেই নেশা হয়ে যায়। শরবতের দিকে তাকিয়ে ইয়াকুব বলল, রঙ দেখে মনে হচ্ছে মারাত্মক হয়েছে। এই ড্রিংকের নাম দিলাম— শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ শরবত। মহসিন বলল, ঠাণ্ডা না হলে খেয়ে মজা পাওয়া যাবে না।

ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না, কারণ সফিকের মামা ফ্রিজ তালাবন্ধ করে গেছেন।

সফিকের নির্দেশে তার দিয়ে খুঁচিয়ে অতি দ্রুতই ফ্রিজ খুলে ফেলা গেল। জিনিস ডিপ ফ্রিজে ঠাণ্ডা করতে দেয়া হলো। ইয়াকুব বলল, সফিক, তোর মামার এই বাড়িতে এসি আছে ?

সফিক শঙ্কিত গলায় বলল, মামির শোবার ঘরে আছে। কেন ?

এসি ছেড়ে দিয়ে ঐ ঘরে সবাই আড্ডা দিতাম। এসি ঘরের সুবিধা হলো হৈচৈ হলেও দরজা-জানালা টাইট করে বন্ধ থাকে, শব্দ বাইরে যায় না।

সফিক বলল, অসম্ভব! মামা-মামির শোবার ঘর খোলাই যাবে না। মামা যদি টের পায় আমাকে খুন করে ফেলবে।

হারুন বলল, নিজের মায়ের আপন ভাই তোকে খুন করে ফেলবে, কারণ তুই তাঁর শোবার ঘরে কিছুক্ষণ বসে ছিলি ?

কিছুক্ষণ তো তোরা বসবি না— একবার ঢুকলে ঐখানেই থাকবি।

হারুন বলল, খুব ভালোমতো চিন্তা করে দেখ, মহসিন যে শরবত বানিয়েছে ঐ শরবত খাবার পর অবশ্যই কিছু হৈচৈ হবে। আশেপাশের ফ্ল্যাটের লোক জানবে। তোর মামার কাছে খবর পৌছে যাবে। তারচে' কি এসি ঘরে বসা ভালো না ?

ঐ ঘর তালাবন্ধ। আমার কাছে চাবি নেই।

চাবি নেই, চাবির ব্যবস্থা হবে। ফ্রিজ যেভাবে খুলেছে ঐ ঘরের দরজাও সেইভাবে খুলে যাবে। চিচিং ফাঁক।

সফিক হতাশ গলায় বলল, যা ইচ্ছা কর। আসলে তোদের খবর দেয়াই ভুল হয়েছে। মিসটেক অব দা সেঞ্চুরি।

হারুন বলল, ভুল করবার জন্যেই তো মানুষ হিসেবে আমাদের জন্ম হয়েছে। আল্লাপাক চাচ্ছেন আমরা ভুল করি। এই জন্যেই আমাদের মানুষ বানিয়ে পাঠিয়েছেন। তিনি যদি চাইতেন আমার শুধু শুদ্ধ করি তাহলে আমাদের ফেরেশতা বানিয়ে পাঠাতেন। আমাদের ভুল করার কোনো উপায় থাকত না।

মহসিন বলল, ফেরেশতাও তো ভুল করে। শয়তান ফেরেশতা ছিল, সে ভুল করেছে। ভুলিয়ে ভালিয়ে গন্দম খাইয়েছে। যার ফলে স্বর্গ থেকে পতন। এখন আমরা হা চাকরি হা চাকরি করছি।

হারুন বলল, শয়তান ফেরেশতা ছিল তোকে কে বলেছে ? শয়তান ছিল জ্বিন।

মহসিন বলল, শয়তান জ্বিন ছিল এই খবর তোকে কে দিয়েছে ? শয়তান এসে তোকে দিয়ে গিয়েছে ? সারা জীবন শুনে এসেছি শয়তান ছিল ফেরেশতা। আদমকে সেজদা না করায় সে অভিশপ্ত। আর আজ তুই জ্বিনের থিওরি নিয়ে এসেছিস। একশ টাকা বাজি শয়তান ফেরেশতা।

হাজার টাকা বাজি শয়তান ফেরেশতা।

হাজার টাকা তোর কাছে আছে ? তুই হাজারপতি কবে থেকে ?

হাজার টাকা সঙ্গে নাই, তাই বলে এক হাজার টাকা জোগাড় করতে পারব না ? আমি পথের ফকির ?

জোগাড় করতে পারলে তো ভালোই— আয় হাজার টাকা বাজি।

অবশ্যই।

মহসিন গম্ভীর গলায় বলল, আজ রাতের মধ্যেই ফয়সালা হবে। তুই যদি হাজার টাকা দিতে না পারিস তাহলে তুই নেংটো হয়ে চারতলা থেকে সিঁড়ি বেয়ে একতলায় দারোয়ানের ঘর পর্যন্ত যাবি। দারোয়ানকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে বলবি, 'হ্যালো মিস্টার!' তারপর আবার ফিরে আসবি।

মহসিনের হাত কাঁপছে। রেগে গেলে তার হাত কাঁপে।

হারুন শান্ত গলায় বলল, ওকে। তুই হারলে তোকেও এই কাজ করতে হবে। তোকেও গিয়ে দারোয়ানকে 'হ্যালো মিস্টার' বলতে হবে।

বলব। আমার কোনো সমস্যা নেই। নো প্রবলেম। আমি রাজি।

আন্ডারওয়ার পরে দৌড় দিলে হবে না। নেংটা মানে নেংটা। পুরো নেংটা বাবা ভোম ভোম। নেংটা কুমার।

ওকে। নেংটা কুমার।

এসি ঘর খোলা হয়েছে। হাই কুলে দিয়ে ঘর ঠাণ্ডা করে ফেলা হয়েছে। মহসিনের বিশেষ শরবত সবাই দু'কাপ করে খেয়েছে। জিনিসটার স্বাদ টক-মিষ্টি। সফিক বলল, টেস্ট তো মারাত্মক হয়েছে। এর মধ্যে আছে কী ?

মহসিন বলল, আছে কী তা দিয়ে দরকার কী ? একশান হচ্ছে কি-না বল।

সফিক বলল, একশান হচ্ছে না। খেতে মজা লাগছে, কিন্তু নো একশান।

খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তো একশান হবে না। সময় লাগবে।

হারুন খাটে উঠে বসেছে। তার কোলে টেলিফোন। শয়তান ফেরেশতা না-কি জ্বিন— এই সমস্যা সমাধানের জন্যে সে নানান জায়গায় চেষ্টা চালাচ্ছে। সে এতই ব্যস্ত যে মহসিনের শরবত খাবার প্রতিও তার আগ্রহ নেই। হারুন বলল, রাতে ডিনারের কোনো ব্যবস্থা আছে ?

সফিক বলল, না।

হারুন বলল, চান্দা তুলে কাউকে পাঠা, নানরুটি আর শিক কাবাব নিয়ে আসুক। পারহেড একটা শিক আর একটা নান। আমার পকেটে দশ টাকা আছে। আমি দিয়ে দিলাম। এই আমার সম্বল।

মহসিন বলল, দশ টাকা সম্বল আর তুই হাজার টাকার বাজি ধরেছিস ?

হারুন বলল, বাজিতে তুই যদি জিতে যাস— হয় তোকে হাজার টাকা দেব, আর নয় তো এখান থেকে নেংটো হয়ে বাসায় ফিরব।

রাত একটা দশ। পুরো দল ঝিমুচ্ছে। শিক কাবাব এবং নানরুটি এসেছে, কেউ কিছু মুখে দেয় নি। শুধু হারুন একাই পাঁচটা শিক এবং তিনটা নানরুটি খেয়ে ফেলেছে। সফিকের অবস্থা খুব খারাপ। সে পাঁচ-দশ মিনিট করে ঘুমাচ্ছে, আবার জেগে উঠছে। তার চোখ গাঢ় লাল।

শয়তান ফেরেশতা না জ্বিন— এই সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। শয়তান জ্বিন।

বাজির শর্ত অনুসারে মহসিন নেংটো হয়ে দারোয়ানের কাছে যেতে এবং ফিরে আসতে রাজি হয়েছে। হারুন দয়াপরবেশ হয়ে বলেছে— যা মাফ করে দিলাম। নেংটো হওয়ার দরকার নেই। সফিক হুঙ্কার দিয়ে উঠেছে— অবশ্যই দরকার আছে। তার উচিত শিক্ষা হতে হবে। না জেনে তর্ক করে। না জেনে বাজি ধরে।

হারুন বলল, এই কাজটা করলে ফ্ল্যাট বাড়িতে জানাজানি হবে। তোর মামার কানে যাবে। তোরই অসুবিধা।

হোক অসুবিধা। আমি কি মামাকে কেয়ার করি ? Who is মামা ?

সাবের চাদর গায়ে দিয়ে কোলবালিস বগলে নিয়ে শুয়েছিল। তার চোখ বন্ধ। এই দলে তার নাম 'নীরব ঘাতক'। সে কখনোই কোনো কথা বলে না। হঠাৎ হঠাৎ দু'একটা এমন কথা বলে যে পুরো দলের মুড বদলে যায়। সাবের চোখ না মেলেই বলল, Who is মে মে। মে মে।

বারুদে আগুন পড়ার মতো হলো। সবাই বলা শুরু করল— মে মে। মে মে। তারা কিছুক্ষণ মে মে করে, তারপর হো হো করে হাসে। আবারো মে মে করে আবারো হাসে। রাত দু'টার দিকে তাদের হাসি বন্ধ হলো। মহসিনকে পাঠানো হলো বাজির শর্তপূরণের জন্যে। মহসিন নির্বিকার ভঙ্গিতেই কাপড় খুলে সিঁড়ি দিয়ে হেঁটে নিচে গেল।

রাত আটটা। সফিক বসার ঘরের মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে আছে। আজ সারাটা দিন তার ঘুমে ঘুমে কেটেছে। মাঝে কয়েকবার ঘুম ভেঙেছে, তাও অল্প সময়ের জন্যে। একবার ঘুম ভাঙল সকাল এগারোটার সময়। সে রেস্টুরেন্ট থেকে হাফ প্লেট তেহারি খেয়ে এসে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। সেই ঘুম ভাঙল বিকাল তিনটায়। রেস্টুরেন্টে গেল। পরোটা আর গোশত খেয়ে সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত ঘুমাল।

ঘুম ভাঙল টেলিফোনের শব্দে। দিল্লি থেকে সফিকের মামা টেলিফোন করেছেন। তাঁর গলা থমথম করছে। সফিক মামার থমথমে গলা অগ্রাহ্য করে আনন্দিত স্বরে বলল, কেমন আছ মামা ? বেড়ানো কেমন হচ্ছে ? তাজমহল দেখেছ ?

সফিকের মামা বললেন, বাসায় তুই ছাড়া আর কে কে আছে ?

সফিক অবাক হয়ে বলল, আমি আছি, আর কে থাকবে ?

জুতিয়ে তোর আমি পিঠের খাল তুলে ফেলব।

সফিক বিস্মিত হবার ভঙ্গি করে বলল, এইসব তুমি কী বলছ মামা! ঘটনা কী ?

চুপ শুয়োর। বদমায়েশের বদমায়েশ।

মামা, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। কেউ কি তোমার কাছে কিছু লাগিয়েছে ?

শাটআপ হারামি।

কী আশ্চর্য, বলবে তো কী হয়েছে ?

আমি খবরাখবর নেয়ার জন্যে আরজু সাহেবের বাসায় টেলিফোন করেছি...

কী বলেছেন আরজু সাহেব... উল্টা পাল্টা কিছু বলেছেন ? মাই গড! মানুষকে বিশ্বাস করা মুশকিল। উনার সঙ্গে একবার আমার দেখা হয়েছিল সিঁড়িতে। আমার তো মনে হলো খুবই ভদ্র মানুষ।

তুই অস্বীকার করতে চাস বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আমার বাড়িতে মচ্ছব বসাস নি ? হৈচৈ-চেঁচামেচি-ড্রাগ খাওয়া খাওয়ি করিস নি ? সবাই মিলে নেংটো হয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করিস নি ?

সফিক মধুর স্বরে বলল, মামা, তুমি রাগের মাথায় কী বলছ নিজেই বুঝতে পারছ না। তোমার রাগ কমানোর জন্যে স্বীকার করলাম তুমি যা বলছ সবই সত্যি। তারপরেও আমার একটা কথা শুনবে। প্লিজ মামা, প্লিজ।

তোর আর কী কথা থাকতে পারে ?

মামা শোন, আমার বন্ধু-বান্ধব সবাই ভদ্র ঘরের ছেলে। শিক্ষিত ছেলে। এমন একজনও নেই যে এম.এ পাস করে নি। আমাদের সমস্যা একটাই— আমরা কোনো চাকরি পাচ্ছি না। আমরা খুবই মন খারাপ করে থাকি। মাঝে মধ্যে এক সঙ্গে হই, চাকরির কোনো লাইন পাওয়া যায় কিনা— এই নিয়ে আলাপ-আলোচনা করি। আমাদের বয়েসি যুবকদের সবাই সন্দেহের চোখে দেখে বলেই কয়েকজন একত্র হলেই মনে করে কিছু করছি, ড্রাগ নিচ্ছি বা মদ খাচ্ছি।

চুপ। চুপ। মিথ্যুক কোথাকার।

ঠিক আছে মামা, তর্কের খাতিরে স্বীকার করলাম আমরা খারাপ। খুবই খারাপ। তোমার বাসায় বসে মদ-ফদ খাচ্ছিলাম। এখন তুমি বলো মামা, আমরা যত খারাপই হই আমাদের পক্ষে কি সম্ভব নেংটো হয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠানামা করা ? এটা কি কোনো লজিকে পড়ে ?

আরজু সাহেব মিথ্যা কথা বলছেন ?

এই কথাটা উনি কেন বলছেন মামা আমি সত্যি জানি না। তবে আমি উনাকে জিজ্ঞেস করব। তুমি টেলিফোন রেখে দিলেই আমি তাঁকে গিয়ে জিজ্ঞেস করব।

তোকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হবে না। তুই এক্ষুণি আমার বাড়ি ছেড়ে চলে যা। এক্ষুণি! এই মুহূর্তে।

এখন চলে যাব ?

হ্যাঁ এখন যাবি। আমি টেলিফোন রাখব আর তুই বাসায় তালা লাগিয়ে বের হবি।

মামা, চাবিটা কি আরজু সাহেবকে দিয়ে যাব ?

হ্যাঁ দিয়ে যা। আমি ঢাকায় এসে তোর বদমায়েশি বের করছি।

উল্টোটাও হতে পারে মামা। দেখা যাবে তুমি লজ্জিত হয়ে আমার কাছে গেলে— বললে, ভুল হয়েছে কিছু মনে করিস না। রাগের মাথায় তোকে অনেক আজেবাজে গালি দিয়েছি।

শাটআপ। এক্ষুণি যা— আরজু সাহেবকে চাবি দিয়ে আয়।

যাচ্ছি। মামা তুমি ভালো থেকো। মামিকে আমার সালাম দিও। কুতুব মিনার দেখে আসতে ভুল করো না। অনেকেই তাজমহল দেখে চলে আসে, কুতুব মিনার দেখে না।

সফিকের কথা শেষ হবার আগেই তার মামা টেলিফোন রেখে দিলেন। সফিক মুখ ভোঁতা করে বসে রইল। এই মুহূর্তে একটা সিগারেট দরকার। তার সঙ্গে সিগারেট নেই। দোকানে গিয়ে সিগারেট কিনতে ইচ্ছা হচ্ছে না। বন্ধু-বান্ধবদের আসার সময় হয়ে গেছে। যে কেউ একজন এলেই সিগারেটের সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। শুধু সাবের এবং মহসিন হলে সমস্যার সমাধান হবে না। এই দুই জন সিগারেট খায় না। মুহিব এলেও হবে না। মুহিব সিগারেট খায় না। মুহিব হাবিজাবি কিছুই খায় না। গল্প-উপন্যাসের ভালো ছেলে। এদের চেহারা হয় রাজপুত্রের মতো। এদের চরিত্রে কোনো ত্রুটি থাকে না। অত্যন্ত রূপবতী

মেয়ের সঙ্গে এদের প্রণয় হয়। এরা পরীক্ষায় ফার্স্ট-সেকেন্ড হয়। এদের চাকরি পেতেও কোনো সমস্যা হয় না। ফর্মুলাতে মুহিব খুব ভালো মতোই পড়ে, শুধু একটা জায়গায় ফর্মুলা মিলছে না। অনেক ঘোরাঘুরি করেও বেচারা চাকরি পাচ্ছে না। মনে হচ্ছে তাকে সোনা-রুপার পানি দিয়ে ধোয়াতে হবে। সোনা-রুপার পানি দিয়ে ধোয়ালে দোষ কাটা যায়।

সাবের, মুহিব, মহসিন— এই তিনজনের যে কেউ এলে তাৎক্ষণিকভাবে সিগারেট পাওয়া যাবে না। সিগারেট কেনার জন্য এদের আবার নিচে পাঠাতে হবে। মার্ফিজ ল বলছে আজ এরাই প্রথম আসবে। মার্ফিজ ল খুবই মজার সূত্র। এই সূত্র বলে— গাদা করে রাখা বইয়ের ভেতর কেউ যদি কোনো একটা বিশেষ বই খোঁজে তাহলে সেই বইটা থাকবে সবার নিচে। সে যদি বুদ্ধি করে নিচ থেকে বইটা খুঁজতে শুরু করে তাহলে বইটা থাকবে সবার উপরে।

সফিক চোখ বন্ধ করে মনে মনে বলল, আল্লাহপাক, তুমি দয়া করে সবার প্রথম সাবের, মুহিব কিংবা মহসিন— এই তিনজনের একজনকে আমার কাছে পাঠাও গো দয়াময়। তুমি দয়ার সাগর। তোমার কাছে এটা কোনো ব্যাপারই না। সফিক এই প্রার্থনা করল কারণ সে দেখেছে আল্লাহর কাছে সে যেটা চায় তার উল্টোটা হয়। যেহেতু সাবের, মুহিব কিংবা মহসিনকে চাওয়া হয়েছে— এই তিনজন আসবে না। অন্য যে কেউ আসবে। তাৎক্ষণিকভাবে সিগারেট সমস্যার সমাধান হবে।

আজ সফিকের দোয়া আল্লাহ ঠিকঠাকমতো শুনলেন। সবার প্রথম মুহিব এসে উপস্থিত হলো। মুহিব এই আড্ডার সর্বকনিষ্ঠ সদস্য। সফিক তাকে বিশেষ স্নেহ করে। মুহিব গত তিনদিনের আসরে অনুপস্থিত। আজ তাকে দেখে সফিকের ভালো লাগছে, তবুও সে বিরক্তি চাপতে পারছে না।

সফিক বলল, মুহিব, তুই চট করে নিচে যা তো, আমার জন্যে এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে আয়। টাকা নিয়ে যা। যাবি আর আসবি।

মুহিব কিছু বলল না। পলিথিনের ব্যাগে মোড়া এক প্যাকেট সিগারেট বের করে এগিয়ে দিল।

সফিক বিস্মিত হয়ে বলল, ব্যাপার কী! সিগারেট ধরেছিস ?

মুহিব বলল, না। আপনার জন্যে এনেছি।

সিগারেট এনেছিস কেন ? কারণ কী ? ভালো খবর আছে ?

জি।

চাকরি পেয়েছিস ?

জি।

অ্যাপয়েনমেন্ট লেটার সাথে আছে?

আছে।

দেখি কী ব্যাপার।

সফিক গভীর মনোযোগে অ্যাপয়েনমেন্ট লেটার পড়ল।

আনন্দিত গলায় বলল, চাকরি তো খুবই ভালো পেয়েছিস।

মুহিব চুপ করে রইল।

সফিক বলল, আজ আর কাউকে কিছু বলিস না। সবাই মন খারাপ করবে। চেপে যা।

মুহিব হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

সফিক বলল, আগামীকাল কোনো এক সময় সবাইকে তোর খবরটা দেব। তুই কিন্তু আর আড্ডায় আসবি না। বুঝেছিস? তুই তোর মতো থাকবি। নতুন বন্ধু-বান্ধব তৈরি করবি। বাসার সবাই খুশি?

বাসায় কাউকে বলি নি।

কেন?

ইচ্ছা করল না।

ইচ্ছা করল না কেন? আচ্ছা থাক, ইচ্ছা না করলে বলতে হবে না। কারো উপর এখন রাগ রাখবি না। মন দিয়ে চাকরি করবি। মামার টেলিফোন পেয়ে মনটা অত্যন্ত খারাপ হয়ে গিয়েছিল, এখন তোর চাকরির খবর শুনে মনের কিছুটা রিপেয়ারিং হয়েছে। হাবিজাবি কিছু খেতে পারলে ফুল রিপেয়ারিং হয়ে যাবে।

মুহিব বলল, আজকের হাবিজাবির খরচ আমি দিব।

তুই দিলে সবাই সন্দেহ করবে। টাকা আমার কাছে দে। কত দিবি?

এক হাজার টাকা সঙ্গে আছে।

দেখি দে টাকাটা— অন্য সবার কাছ থেকে চাঁদা তুলে আজ না হয় কিছু ভালো হাবিজাবি খাই। গতকাল মহসিন এমন এক জিনিস বানিয়ে দিয়েছে যে ঘুমায়ে কূল পাই না। মনে হয় আফিম-টাফিম মিশিয়েছে। মহসিনের এক্সপেরিমেন্ট বন্ধ করতে হবে। কোন দিন দেখা যাবে সবাই মরে পড়ে আছি। আজ রাতে কি তোকে বাসায় ফিরতে হবে?

না ফিরলেও চলে।

তাহলে আজ রাতে থেকে যা। বাসায় যদি দুশ্চিন্তা করে একটা টেলিফোন করে দে। আজ রাতটা সবাই মিলে হৈচৈ করে কাটাই— কারণ অদ্য শেষ রজনী।

শেষ রজনী কেন ?

এই বাড়িতে শেষ রজনী। মামা গেট আউট করে দিয়েছে। খুবই খারাপ ব্যবহারও করেছে। কুৎসিত গালাগালি। আমি আপন ভাগ্নে, সেই দিকে খেয়াল নেই। কুত্তার বাচ্চা শুয়োরের বাচ্চা বলে যাচ্ছে। এর ফল মামাকে ভোগ করতে হয়। মামা হোক চাচা হোক— সস্তায় পার পাবে কেন ?

আপনি কী করবেন ?

অনেকগুলি প্ল্যান মাথার ভেতর আছে। কোন প্ল্যান এক্সিকিউট করব বুঝতে পরছি না। দেখি সবাই আসুক। সবার সাথে আলোচনা করে দেখি। একা একা ডিসিশান নেয়া ঠিক হবে না।

রাত ন'টা পঁচিশ। এমন কিছু রাত না, কিন্তু আসর জমে গেছে। ঝড়-বৃষ্টির কারণে সবাই আগে-ভাগে এসে পড়েছে। দুই দফা 'হাবিজাবি' খাওয়া হয়েছে। সবাই উৎফুল্ল এবং সামান্য উত্তেজিত। তবে অন্যদিনের মতো কারো গলাই চড়ছে না। সবাই কথা বলছে নিচু গলায়। আজ আবহাওয়া শীতল। সবার খানিকটা শীত শীতও করছে। তারপরেও এসি চলছে। ঘর ক্রমেই ঠাণ্ডা হচ্ছে।

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু— সফিকের মামাকে (ইতিমধ্যে তাঁর নাম হয়েছে আজমীর মামা) কী শাস্তি দেয়া যায় ? অনেকগুলি প্রস্তাব এসেছে। প্রথম প্রস্তাব দামি দামি সমস্ত ইলেকট্রনিক জিনিসপত্র নষ্ট করে দেয়া। এসি, টিভি, ফ্রিজ, মিউজিক সিস্টেম।

সফিক এই প্রস্তাবে রাজি হয় নি। সে বলেছে— মামা খুবই কৃপণ মানুষ। এই জিনিসগুলি তাঁর সন্তানের মতো। নিজের কোনো সন্তান নেই বলে এইগুলিকে তিনি সন্তানের চেয়েও বেশি স্নেহ করেন। এদের ক্ষতি হলে তিনি হার্টফেল করে মারা যাবেন। তাঁকে শাস্তি দিতে হলে মানসিক শাস্তির লাইন ধরতে হবে।

তখন প্রস্তাব হলো (নীরব ঘাতক সাবেরের প্রস্তাব) গরু, ছাগলের রক্ত এনে শোবার ঘরে রক্ত দিয়ে মাখামাখি করে রাখা হোক। রক্তমাখা একটা ছুরি রেখে দেয়া হবে। রক্ত শুকিয়ে জমে থাকবে। বিছানার চাদরেও রক্ত মাখানো থাকবে। সব থাকবে লণ্ডভণ্ড। ভদকার একটা বোতল ভেঙে চারদিকে কাচ ছড়িয়ে রাখা

হবে। যাতে এই ঘরে ঢুকেই মনে হবে এখানে একটা হত্যাকাণ্ড হয়েছে। তখন আজমীর মামার 'বিচি' আসল জায়গা ছেড়ে কপালে উঠে যাবে।

প্রস্তাব সবার পছন্দ হলো। শুধু মহসিন বলল, আজমীর মামা যদি থানা পুলিশ করেন, তখন কী হবে? পুলিশ তো আমাদের খোঁজ করবে।

সফিক বলল, খোঁজ করলে করবে। আমরা তো কাউকে খুন করি নি। আমাদের সমস্যা কী! দু'একদিন যদি থানাতে থাকতে হয় থাকলাম।

রেজা বলল, রক্ত এনে কখন ফেলা হবে?

সাবের বলল, এখন ফেলা হবে। কাল ভোরে তো আমরা চলে যাচ্ছি। আজমীর মামার বাসায় আর আসব না।

রেজা বলল, রক্ত কে আনবে?

হারুন বলল, আমি আনব। আমাদের বাসার কাছে সাত মসজিদ রোডে কসাই আছে। আমার পরিচিত। দুলা ভাইয়ের কুকুরের জন্যে তার কাছ থেকে প্রায়ই মাংসের ছোবড়া কিনি। মাঝে মাঝে রক্ত কেনা হয়।

সফিক বলল, তাহলে দেরি করছিস কেন, চলে যা। পরে দেখা যাবে কসাই চলে গেছে।

কসাই চলে গেলে নিউমার্কেট থেকে নিয়ে আসব। রক্ত নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে না। দেখি আমাকে ভর্তি করে এক গ্লাস 'হাবিজাবি' দাও। গাঁজা থাকলে ভালো হতো। আমার কাছে খুবই একসাইটিং লাগছে। এর মধ্যে গাঁজার বাতাস পড়লে...।

সফিক বলল, একজন কেউ গাঁজা নিয়ে আস। আজ একটা বিশেষ দিন। আমাদের মধ্যে একজন চাকরি পেয়েছে। একজন মেম্বার আমরা হারাতে যাচ্ছি। সেই উপলক্ষে একই সঙ্গে আনন্দ এবং নিরানন্দ পার্টি। গাঁজা ছাড়া এই পার্টি হবে কীভাবে?

হারুন বিস্মিত গলায় বলল, চাকরি কে পেয়েছে?

সফিক বলল, চাকরি কে পেয়েছে সেটা তো আমি আজ বলব না।

হারুন বলল, তুই না তো?

সফিক বলল, আমি না।

আল্লাহর কসম বল।

আল্লাহর কসম বলতে পারব না। তবে আমি না।

হারুন বলল, তোর ভাব-ভঙ্গি, কথাবার্তার ধরন-ধারণ সবই অন্যরকম লাগছে। আমার তো ধারণা তুই চাকরি পেয়েছিস।

সফিক বলল, আমি চাকরি পেয়েছি এটা বলব না, আবার চাকরি পাই নি এটাও বলব না। এই বিষয়ে আজ কোনো ডিক্লারেশন দেয়া হবে না। কথা বলে সবাই সময় নষ্ট করছে কেন— এই ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। রক্ত কই ? গাঁজা কই ?

রাত এগারোটার ভেতর গরুর রক্ত দিয়ে ঘর মাখামাখি করে ফেলা হলো। রক্তের মধ্যে একটা মাছ কাটা বটি ডুবিয়ে রাখা হলো। ভয়াবহ অবস্থা। মহসিন মিনমিনে গলায় বলল, সর্বনাশ! দেখে তো আমার নিজেরই ভয় লাগছে। শরীর ঝিমঝিম করছে।

হারুন বলল, বোতল ভেঙে দেয়ার দরকার নেই। এমনিতেই যথেষ্ট হয়েছে। জিনিসপত্র বেশি থাকলে 'Fake' মনে হতে পারে। কোনো কিছুই ওভার ডু করতে নেই।

ইয়াকুব বলল, একটা ছবি তুলে রাখা দরকার ছিল। জিনিসটা যে এত ইন্টারেস্টিং হবে আগে বুঝতে পরি নি। আগে বুঝতে পারলে বাসা থেকে ক্যামেরা নিয়ে আসতাম। আজমীর মামার খবর আছে। মামার বিচি শুধু যে কপালে উঠে থেমে থাকবে তা না, মাথা ফুঁড়ে বের হয়ে যাবে।

নীরব ঘাতক সাবের বলল, আমরা শুধু আজমীর মামাকে শাস্তি দেয়ার কথা ভাবছি। আসল যে লোককে শাস্তি দেয়া উচিত তার কথা ভাবছি না। মূল অপরাধী শাস্তি পাচ্ছে না।

সফিক বলল, কার কথা বলছিস ?

আরজু সাহেবের কথা বলছি। উনার কারণেই তো এই অবস্থা। আজ আমরা আশ্রয়হারা। গৃহহারা। আজ আমরা পথহারা পাখি।

সফিক বলল, কথা সত্যি। উনাকে কী শাস্তি দেয়া যায় ?

সাবের বলল, উনাকে ডেকে নিয়ে এসে এই ঘর দেখিয়ে দেই। তাতেই উনার খবর হয়ে যাবে। তারপর উনাকে বলি— ডিয়ার স্যার, আপনি খবর দিয়েছেন আমরা সবাই না-কি নেংটো হয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠানামা করেছি। কাজটা তো স্যার ঠিক করেন নি। আমরা সামান্য রাগ করেছি। এখন আপনি যদি স্যার দয়া করে একবার শুধু নেংটো হয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠানামা করেন তাহলে আমাদের রাগটা কমে। আমরা আবার রেগে গেলে ভয়ঙ্কর হয়ে যাই।

সাবেরের কথা শেষ হবার পর দলের সবাই কিছুক্ষণের জন্যে নীরব হয়ে গেল। নীরবতা ভঙ্গ করে ইয়াকুব বলল, অসাধারণ আইডিয়া! একবিংশ

শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আইডিয়া! আমার হাতে নোবেল পুরস্কার থাকলে আইডিয়ার জন্যে সাবেরকে নোবেল পুরস্কার দিয়ে দিতাম।

হারুন বলল, আরজু সাহেবকে এখানে কে ডেকে আনবে ? ঘণ্টা কে বাঁধবে ?

সফিক বলল, এটা কোনো ব্যাপার না। মুহিব যাবে। মুহিবের রাজপুত্রের মতো চেহারা। সে যা বলে সবাই তা বিশ্বাস করে। মুহিব উনাকে বলবে যে, আমরা তাঁর হাতে বাড়ির চাবিটা দিতে চাই। চাবি দেয়ার আগে ঘরগুলি খুলে উনাকে দেখিয়ে বুঝিয়ে দিতে চাই যে সব ঠিক আছে। কী-রে মুহিব, তুই গুছিয়ে সুন্দর করে বলতে পারবি না ?

মুহিব বলল, পারব।

সফিক বলল, মুহিবকে পাঠানোর সবচে' বড় সুবিধা হলো, ওর মুখে কোনো হাবিজাবির গন্ধ নেই। আমি নিজেই যেতাম কিন্তু আমার মুখ থেকে ভকভক করে হাবিজাবির গন্ধ বের হচ্ছে।

মুহিব বলল, কোনো অসুবিধা নেই। আমি যাচ্ছি।

ইয়াকুব বলল, ঘুমিয়ে পড়লে ঘুম থেকে ডেকে তুলবি।

কলিংবেল বাজতেই আঠারো-উনিশ বছরের কিশোরী ধরনের মুখের একটা মেয়ে দরজা খুলে দিল। মুহিবকে দেখে সে খুবই হকচকিয়ে গেল। এই সময়ের মেয়ে এত সহজে হকচকিয়ে যায় না। মুহিব বলল, স্লামালিকুম। মেয়েটা এতে আরো ঘাবড়ে গেল। মুহিব বলল, আরজু সাহেব কি আছেন ?

মেয়েটি ক্ষীণ গলায় বলল, বাবা শুয়ে পড়েছেন। এখনো ঘুমান নি। আমি এক্ষুণি উনাকে ডেকে নিয়ে আসছি। বলেই ছুটে বের হয়ে গেল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাবাকে নিয়ে উপস্থিত হলো।

মুহিব বলল, স্যার, আপনি একটু উপরে আসবেন ? ফ্ল্যাট নাম্বার D4। আব্দুল গফুর সাহেবের ফ্ল্যাট।

কী ব্যাপার বলো তো ? আমি কিন্তু বাবা তোমাকে চিনতে পারছি না।

D4 ফ্ল্যাটের মালিক আব্দুল গফুর সাহেবের ভাগ্নে সফিকের আমি বন্ধু।

ও আচ্ছা আচ্ছা।

মুহিব বলল, গফুর মামা সফিকের উপর খুব রাগ করেছেন। উনি বলেছেন সবগুলি ঘর দেখিয়ে তারপর যেন আপনার হাতে চাবি দেয়া হয়।

বাবা কোনো দরকার নেই। তুমি চাবিটা আমার কাছে দিয়ে যাও।

গফুর মামা ঘরগুলি দেখিয়ে আপনার হাতে চাবি দিতে বলেছেন। উনি খুবই আপসেট।

আমার আসলে উনাকে কিছু জানানোই উচিত হয় নি। তোমাকে দেখে এখন তো আমার নিজের কাছেই খুব খারাপ লাগছে। আসলে হয়েছে কী, একটা ছেলেকে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখে... আমি নিজেই দেখলাম। সে আমাকে দেখে মোটেই লজ্জা পেল না। খুবই স্বাভাবিক গলায় বলল, হ্যালো মিস্টার।

মুহিব ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, ও আমাদের বন্ধু। মহসিন নাম। জুলজিতে M.Sc পাস করেছে। অনার্স এমএসসি দুটাতেই ফার্স্টক্লাস পাওয়া। তিন বছর চেষ্টা করেও কোনো চাকরি পাচ্ছিল না। মনটন খুব খারাপ থাকত। হঠাৎ খবর এসেছে তার মা মারা গেছে। আমরা তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যেই এই বাড়িতে নিয়ে এসেছিলাম। খবরটা শোনার পর হঠাৎ কী যেন হলো।

বলো কী! খুবই দুঃখজনক ঘটনা। আমার বোঝার ভুল।

ভদ্রলোক মেয়ের দিকে তাকিয়ে হতাশ গলায় বললেন, যূথী মা, দেখ তো কী লজ্জার মধ্যে পড়লাম— মা'র মৃত্যুতে একটা ছেলের সুখে-দুখে মাথা ইয়ে হয়ে গেছে আর আমি কি-না... ছিঃ ছিঃ।

যূথী বলল, বাবা, তুমি উনার সঙ্গে যাও। ঐ ভদ্রলোক যদি থাকেন তার কাছে ক্ষমা চাও।

অবশ্যই ক্ষমা চাইব। বাবা, তোমার নাম কী ?

আমার নাম মুহিব।

চা খাও।

জি-না, আমি চা খাব না।

চা তো খেতেই হবে। চলো উপরে যাই, সবার সঙ্গে কথা বলে আসি। তারপর না হয় সবার সঙ্গেই চা খাব। মুহিব বাবা শোন, এ হলো আমার বড় মেয়ে— ডাক নাম যূথী। ভালো নাম শায়লা। খুবই ভালো ছাত্রী। এসএসসিতে ছেলেমেয়ে সবার মধ্যে ফিফথ হয়েছে। মেয়েদের মধ্যে প্রথম। এর ছোট্ট একটা ইন্টারভিউ বিটিভিতে প্রচার করেছিল। টিভি'তে তাকে অবশ্যি অনেক বড় বড় লেগেছে। আমি নিজেই চিনতে পারি নি।

যূথী লজ্জিত গলায় বলল, বাবা চুপ করো তো।

ভদ্রলোক মুহিবের দিকে তাকিয়ে বললেন, বাবা চলো যাই।

আরজু সাহেব আজমীর মামার শোবার ঘরের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর শরীর কাঁপছে। কপাল ভর্তি ঘাম। কপালের ঘাম নাক বেয়ে টুপটুপ করে পড়ছে। তিনি ভাঙা গলায় বললেন, এখানে কী হয়েছে ?

সফিক বলল, তেমন কিছু হয় নি। আমরা কাটাকুটি খেলেছি।

তার মানে কী ?

সব কিছুর মানে কি পরিষ্কার করে বলা যায় ? বলা যায় না। বলা উচিতও না।

আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

সাবের বলল, বুঝতে না পারাই তো ভালো। এই জগতে যত কম বুঝবেন তত ভালো। বেশি বুঝলে ধরা খেয়ে যাবেন। একজন বেশি বুঝেছিল বলে ধরা খেয়েছে— মামার শোবার ঘরটা নোংরা হয়েছে।

আমি যাই।

সাবের বলল, অবশ্যই যাবেন। যাবার আগে আমাদের জন্যে ছোট্ট একটা কাজ করে দিতে হয় যে।

আরজু সাহেব কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, কী কাজ ?

মফিজ বলল, আমাদের বন্ধু যেমন নেংটো হয়ে সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে গিয়েছিল সে-রকম একটা নেংটা দৌড় দেবেন। আপনার পরনে লুঙি। নেংটা হওয়া আপনার জন্যে কোনো ব্যাপারই না।

আরজু সাহেব বললেন, বাবা তুমি কী বলছ ?

নেংটা হতে যদি লজ্জা লাগে তাহলে তারও ওষুধ আছে। দু'গ্লাস মাল খেয়ে নিন। দেখবেন লজ্জা-শরম কোথায় চলে যাবে।

ভদ্রলোক বিড়বিড় করে বললেন, মাল খাব। মাল।

মহসিন এগিয়ে এসে আচমকা টান দিয়ে ভদ্রলোকের লুঙি খুলে ফেলল। তিনি কোনো আপত্তি করলেন না বা চেঁচিয়েও উঠলেন না। অদ্ভুত দৃষ্টিতে সবার দিকে তাকাতে লাগলেন। একবার শুধু বিড়বিড় করে ডাকলেন— যূথী, ও মা যূথী।

বেকার মানুষদের জন্যে সপ্তাহের সবচে' অস্বস্তিকর দিন হলো ছুটির দিন। যারা কাজেকর্মে থাকে এই দিনে তাদের মধ্যে ঢিলে ভাব চলে আসে যেন পায়জামার গিঁঠ বেশ খানিকটা আলগা করে দেয়া হলো। পা নাচানোর অভ্যাস যাদের নেই তাদেরকেও দেখা যায় খবরের কাগজ মুখের সামনে ধরে পা নাচাচ্ছে। বেকাররা পড়ে যায় অস্বস্তিতে। ছুটির দিনগুলির সঙ্গে নিজেদের মিলাতে পারে না। তাদের মধ্যে বোকা বোকা ভাব চলে আসে।

মুহিবকে এখন বেকার বলার কোনো কারণ নেই। চাকরিতে জয়েন সে করে নি, কিন্তু এক তারিখেই করবে। ছুটির দিনে তার অস্বস্তি বোধ করার কোনো কারণ নেই। সে অবশ্যই একটা খবরের কাগজ কিনে এনে পা দোলাতে দোলাতে পড়তে পারে। খবরের কাগজ কিনতে হবে কারণ এ বাড়িতে যে দু'টা কাগজ রাখা হয় তার কোনোটাই দুপুরের আগে রিলিজ হয় না। একটা ইংরেজি কাগজ তৌফিকুর রহমান সাহেব রাখেন। এই কাগজটা তিনি পড়েন দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে শুয়ে। দুপুরের খবরের কাগজ না পড়লে তাঁর ঘুম হয় না। যে-সব বিশেষ বিশেষ দিনে কাগজ বের হয় না সে-সব দিনগুলিতে তাঁর খুবই সমস্যা হয়। সন্ধ্যা পর্যন্ত বিছানায় গড়াগড়ি করেন। ঘুম আসে না। দ্বিতীয় কাগজটা বাড়ির সবার জন্যে। এই কাগজ হাতে পাওয়া খুব সমস্যা। কাগজটা কে আগে পড়বে এই নিয়ে ঠাণ্ডা স্নায়ুযুদ্ধও হয়। মনোয়ারা বাড়ির কর্ত্রী হিসেবে কাগজটা প্রথম পড়বেন এরকম আশা করেন। তিনি কাগজ কখনোই আগে হাতে পান না।

মুহিব ঠিক করে রেখেছে যেদিন চাকরিতে জয়েন করবে সেদিন থেকে হকারকে বলে দেবে চারটা বাংলা কাগজ দিয়ে যেতে। নাশতার টেবিলে চারটা কাগজ পড়ে থাকবে, যার যেটা ইচ্ছা উঠিয়ে নাও। তখন যদি কেউ প্রশ্ন করে, ব্যাপার কী ? তখন না হয় বলা যাবে। মুহিব এখনো কাউকে কিছু বলতে পারছে না কারণ সে নিজেও চাকরির ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারছে না। তার মনে প্রবল সন্দেহ— এক তারিখে সে যখন জয়েন করতে যাবে তখন তাকে বলা হবে, সামান্য ভুল হয়েছে। পরে যোগাযোগ করুন।

এমন উদাহরণ আছে। সফিকের বেলায় এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। নান্দাইল গার্লস কলেজে ইতিহাসের লেকচারার পোস্টে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেয়ে সে বিছানা বালিশ নিয়ে জয়েন করতে গেল। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল সাহেব তাকে চা-টা খাইয়ে আদর-আপ্যায়ন করে বললেন— ক্ষুদ্র একটা সমস্যা হয়েছে। মন্ত্রীর সুপারিশে এডহক ভিত্তিতে একজনকে নিয়ে নেয়া হয়েছে। আপনি বরং গভর্নিং কমিটির সেক্রেটারি সাহেবের সঙ্গে কথা বলেন।

সফিক বলল, উনার সঙ্গে কথা বলে কী হবে?

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বললেন, কিছুই হবে না। মনের শান্তি।

মনের শান্তি দিয়ে আমি করব কী?

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, সেটাও একটা কথা।

চাকরি নিয়ে মুহিবের ভালোরকম দুশ্চিন্তা আছে বলেই সে প্রতিরাতেই চাকরি নিয়ে দুঃস্বপ্নের মতো দেখছে। গত রাতের দুঃস্বপ্ন হলো— সে জয়েন করতে গিয়েছে। ম্যানেজার সাহেব একটা কাগজ বের করে বললেন, এখানে সই করুন। মুহিব বলল, আপনার কলমটা একটু দিন। ম্যানেজার সাহেব চোখ সরু করে বললেন, কলম ছাড়া চাকরি করতে এসেছেন! এরকম ঘটনা আমার জীবনে ঘটে নি। আপনি শুধু যে কলম ছাড়া চাকরি করতে এসেছেন তা না, লুঙ্গি পরে চলে এসেছেন। খালি পায়ে এসেছেন, না-কি পায়ে স্যান্ডেল আছে?

মুহিব তাকিয়ে দেখল সত্যি সত্যি তার পরনে লুঙ্গি। পা খালি। এক পা কাদায় মাখামাখি।

টেনশনে সে ঘেমে গেল। তার বুক ধড়ফড় করতে লাগল। বুক ধড়ফড়ানি নিয়েই তার ঘুম ভাঙল। যতই দিন যাচ্ছে ততই মুহিব নিশ্চিত হচ্ছে চাকরি হবে না।

দরজায় টুকটুক শব্দ হচ্ছে। মুহিব সাড়া দিল না। সকালবেলাতেই টুকটুকানি ভালো লাগে না।

মুহিব, দরজা খোল।

মায়ের গলা। মুহিব বিছানা থেকে নামল। ছুটির দিনের সকালবেলায় মাতৃমুখ দর্শন তার জন্যে কোনো সুখকর ব্যাপার না। তাকে কোথাও যেতে হবে। সম্ভাবনা শতকরা ৯০ ভাগ যে মনোয়ারা তাকে তাঁর বড় মেয়ের কাছে গোপন চিঠি দিয়ে পাঠাবেন।

মনোয়ারা তার বড় মেয়ের সঙ্গে গোপন চিঠি চালাচালি করেন। মুহিব পোস্টম্যান। আজও মনে হয় রানারের ভূমিকা পালন করতে হবে।

মুহিব দরজা খুলল। মনোয়ারা চায়ের কাপ হাতে গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। এটা একটা বিস্ময়কর ঘটনা।

নে চা খা।

হঠাৎ চা! ব্যাপার কী মা ?

বড় বৌমা তোফাজ্জলের জন্যে চা বানিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। আমি বললাম, মুহিবের জন্যেও এক কাপ বানাও।

শুধু চা দিতে এসেছ ? না-কি আরো কিছু বলবে। বড় আপার কাছে যেতে হবে ?

মনোয়ারা ছেলের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, তুই কি ঘটনা কিছু শুনেছিস ?

কী ঘটনা ?

গতকাল রাতে তুই বাসায় ছিলি না ?

না।

কোথায় ছিলি ?

আমার এক বন্ধুর মামার বাসায় ছিলাম।

এই জন্যেই তুই কিছু জানিস না। গতকাল রাতে তোফাজ্জলের টাকা চুরি গেছে। পঞ্চাশ হাজার টাকার একটা বান্ডিল। ড্রেসিং টেবিলের উপরে টাকাটা ছিল।

এত টাকা বাসায় ছিল ?

ওরা কালার টিভি কিনবে। আলাদা টিভি দেখবে। বৌমার বুদ্ধি। এই মেয়ে ছেলেটার মাথা খারাপ করে দিচ্ছে। আলাদা টিভি দেখার কী আছে তুই বল। এইসব আমার এখন আর ভালো লাগে না। আমি ঠিক করেছি এদের সঙ্গে থাকব না।

থাকবে কোথায় ?

মনোয়ারা চুপ করে রইলেন।

চিন্তা করে বের কর কোথায় থাকতে চাও। আমি দিয়ে আসব।

মনোয়ারা সরু গলায় বললেন, মাকে কোথাও ফেলে দিয়ে আসার জন্যে তুই এত ব্যস্ত ?

মুহিব বলল, তুমি যেতে চাচ্ছ বলেই তোমাকে রেখে আসতে চাচ্ছি। মাতৃ আদেশ পালন করছি। চা-টা ভালো হয়েছে। আরেক কাপ চা খাওয়াতে পারবে ?

মনোয়ারা জবাব দিলেন না। চিন্তিত মুখ করে বসে রইলেন।

মুহিব বলল, মা, তোমার কথা শেষ হয়েছে না আরো কিছু বলবে ?

মনোয়ারা বললেন, তোর এখানে বসে থাকলে কি কোনো সমস্যা আছে ?

কোনো সমস্যা নেই। সারাদিন বসে থাক।

ফাজিলের মতো কথা বলছিস কী মনে করে ? বাংলাদেশের কোনো ছেলেকে দেখেছিস মায়ের সঙ্গে এইভাবে কথা বলে ? সব রসুনের এক পাছা। তোরা তিন ভাই-ই এক রকম। তোদের মধ্যে তোফাজ্জল হচ্ছে হাড়ে গোশতে বদ। বউ-এর চোখের ইশারায় চলে। এখন হুকুম জারি করেছে প্রত্যেকের ট্রাঙ্ক-স্যুটকেস খুলে চেক করা হবে। টাকার জন্যে চাকর-বাকরদের পুটলা-পুটলি চেক করা এক কথা, আর প্রত্যেকের ট্রাঙ্ক-স্যুটকেস চেক করা ভিন্ন কথা। এখন মনে কর, তোর বড়চাচার স্যুটকেস খোলা হলো— ব্যাপারটা তোর বড়চাচার কেমন লাগবে ?

মুহিব হাই তুলতে তুলতে বলল, যদি বড়চাচার স্যুটকেস খুলে পঞ্চাশ হাজার টাকার বান্ডিলটা পাওয়া যায় তাহলে খুব খারাপ লাগবে। মা শোন, আমি ঠিক করেছি আবার ঘুমিয়ে পড়ব। ঘুমের দ্বিতীয় অধিবেশন। কাজেই এখন চলে যাও।

ঘর থেকে বের করে দিচ্ছিস! তোর এত বড় সাহস ? নিজের মাকে বলতে পারলি ঘর থেকে এক্ষুণি বের হয়ে যাও।

এরকম কঠিন করে তো মা বলি নি। সফটলি বলেছি।

মনোয়ারা উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে তিনি এক্ষুণি কেঁদে ফেলবেন। মুহিব বিছানায় শুয়ে পড়তে পড়তে বলল, মা, আমার একটা উপদেশ শোন। ভাইজানের কাছ থেকে তুমি যদি টাকাটা সরিয়ে থাক তাহলে আমার কাছে পাচার করে দাও। তোমার স্যুটকেস থেকে টাকা বের হলে তুমি বিরাট লজ্জার মধ্যে পড়বে।

তুই কী বললি ? কী বললি তুই ?

কী বলেছি তুমি তো শুনেছ।

মনোয়ারা কেঁদে ফেললেন। শাড়ির আঁচলে চোখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠলেন। ভাঙা গলায় বললেন— নিজের মা'কে নিয়ে এমন একটা কুৎসিত কথা তুই কীভাবে ভাবলি ?

মুহিব উঠে বসতে বসতে বলল— মা শোন, আমি যখন ক্লাস সেভেনে পড়ি তখন তুমি বাবার মানিব্যাগ থেকে তিন হাজার টাকা সরিয়েছিলে। তারপর নিজেই টাকা চুরির জন্যে দোষী সাব্যস্ত করলে আমাদের বাসার কাজের ছেলেটাকে। তার নাম ছিল রুকু। তুমি তাকে এমন মার মারলে যে তার বাঁ হাত ভেঙে গেল। বাবা তাকে হাসপাতালে নিয়ে সেই হাত প্লাস্টার করিয়ে আনলেন।

মনোয়ারা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন, তোর মতো ছেলে আমি কী করে পেটে ধরলাম ? এই ছেলে নিজের মা'কে বলছে চোর ?

মুহিব শান্ত গলায় বলল, মা শোন, ফোঁসফোঁসানি বন্ধ কর। তোমার ভাবভঙ্গি থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে টাকাটা তুমি নিয়েছ। বড়ভাবি অবশ্যই তোমাকে সন্দেহ করছেন। সন্দেহ করছেন বলেই বলা হচ্ছে সবার ট্রাঙ্ক-স্যুটকেস চেক করা হবে। তোমার কাছে টাকাটা পাওয়া গেলে খুবই কেলেঙ্কারী ব্যাপার হবে। তুমি এক কাজ কর— টাকাটা এক্ষুণি এনে আমার ড্রয়ারে রাখ। পুরোটাই আছে, না কিছু খরচ করে ফেলেছ ? মা, ঠিকঠাক জবাব দাও। আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই। পুরো টাকাটা আছে ?

পাঁচশ খরচ করেছি।

আমার জন্যে এক কাপ চা নিয়ে এসো, আর বাকি টাকাটা এনে আমার ড্রয়ারে রেখে দাও।

মনোয়ারা চোখ মুছে ছেলের ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

ছুটির দিনের সকাল অনেক দেরিতে শুরু হয়। মুহিব সেই হিসেব করে সাড়ে দশটার দিকে ঘর থেকে বের হলো। তার কাছে পরিস্থিতি খুবই স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। যে টেনশনে মনোয়ারা মুখ শুকনো করে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন কোথাও তার ছোঁয়া দেখা গেল না। মুহিবের বড় ভাই তোফাজ্জল খবরের কাগজ হাতে নাস্তার টেবিলে। ছুটির দিন হিসেবে স্পেশাল নাশতা বানানো হয়েছে— খাসির মাংসের তেহারি। তোফাজ্জলের সামনে প্লেট ভর্তি তেহারি। সে খুবই আগ্রহের সঙ্গে তেহারি খাচ্ছে এবং পত্রিকা পড়ছে। পঞ্চাশ হাজার টাকার একটা বান্ডিল চুরি হয়েছে, তার ছাপ তোফাজ্জলের মুখে নেই। বরং তাকে আনন্দিত দেখাচ্ছে। মুহিবকে দেখে সে বলল, যুবরাজের খবর কী ?

মুহিব কিছু বলল না।

তোফাজ্জল বলল, চাকরি-বাকরি নেই, তোর চেহারা তো চিমসে মেরে যাওয়ার কথা। অথচ যত দিন যাচ্ছে তোর চেহারা খোলতাই হচ্ছে। রহস্যটা কী ?

এই প্রশ্নের জবাব হলো লজ্জিত ভঙ্গির হাসি। সেই হাসি কেন যেন আসছে না।

তুই এক কাজ কর— মতিঝিল এলাকায় ঘোরাঘুরি না করে এফডিসি এলাকায় ঘোরাঘুরি কর। কোনো পরিচালকের নজরে পড়লে তোকে ফিল্মে নিয়ে নিবে। আমি কিন্তু ঠাট্টা করছি না। আমি সিরিয়াস।

মুহিব ভাইয়ের পাশে বসেছে। সকালবেলায় তৈলাক্ত তেহারি দেখে গা গুলাচ্ছে। বেগুন ভাজা দিয়ে রুটি খেতে ইচ্ছা করছে। ঘরে বেগুন অবশ্যই আছে। দুটা রুটি সেঁকে দিতে বেশি যন্ত্রণা হবার কথা না। সেই নির্দেশ মুহিব দিতে পারছে না।

তোফাজ্জল মুখের উপর থেকে পত্রিকা নামিয়ে বলল, সফিক নামে তোর কোনো বন্ধু আছে ?

মুহিব বলল, আছে।

কমনসেন্স বলে একটা জিনিস যে বাজারে প্রচলিত আছে তার ব্যাপারে সেটা মনে হলো না। I am so annoyed.

কী করেছে ?

ভোর ছ'টার সময় টেলিফোন করে তোকে চাচ্ছে। আমি বললাম, জরুরি কিছু ? সে বলল— না, জরুরি কিছু না।

আমি বললাম, জরুরি কিছু না হলে পরে টেলিফোন করো। ছুটির দিনে ভোর ছ'টায় জরুরি কোনো কারণ ছাড়া টেলিফোন করা অপরাধের মধ্যে পড়ে। সে টেলিফোন রেখে দিয়ে ঠিক বিশ মিনিটের মাথায় আবার টেলিফোন করেছে। আমি 'স্টুপিড' বলে গালি দিতে চাচ্ছিলাম। শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলিয়েছি। তুই তোর বন্ধুকে বলে দিস— সে যেন কখনো ছুটির দিনে দশটার আগে টেলিফোন না করে।

জি আচ্ছা, বলে দেব ।

তুই আবার আমার কথায় রাগ করছিস না তো ? বেকার যুবকরা অতিরিক্ত সেন্টিমেন্টাল হয়। তারা ধরেই নেয় পৃথিবীর সবাই তাদেরকে অপমান করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে আছে। তুই বরং এক কাজ কর, নাস্তা খেয়ে তোর বন্ধুর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বল। ঘটনা কী জান। নিশ্চয়ই কোনো সমস্যা আছে, নয়তো ভোর ছটায় কেউ টেলিফোন করে না।

মুহিব টি-পট থেকে কাপে চা ঢালল। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে নিজের ঘরে চলে যাওয়া, বিছানায় পা ছড়িয়ে ছুটির দিনের মতো চা খাওয়া। চা খেতে খেতে এক ফাঁকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা পড়া যেতে পারে। বৃষ্টির পানিতে কাগজটা প্রায় গলন্ত অবস্থায় চলে গিয়েছিল। সেটা শুকানো হয়েছে। শক্ত কাগজে পেস্ট করা হয়েছে। একবার লেমনেট করার চিন্তাও এসেছিল। জীবনের প্রথম চাকরির অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা যত্ন করে রেখে দেয়া হলো।

তোফাজ্জল বলল, কিরে তুই উঠে যাচ্ছিস কেন ?

ঘরে বসে চা খাব।

ঘরে বসে চা খাবার দরকার পড়ল কেন ? সিগারেট ধরেছিস ?

না।

মিথ্যা বলার দরকার নেই। ধরলে ধরেছিস। সামান্য সিগারেট নিয়ে মিথ্যা বলা ঠিক না। ছোট মিথ্যা থেকে শুরু হয় বড় মিথ্যা। ইংরেজিতে একটা প্রবচন আছে— You start by cutting grass, you end up by killing man. আচ্ছা যা, ঘরে গিয়ে সিগারেট খেতে খেতে আরাম করে চায়ে চুমুক দে। সিগারেট দিয়ে সকালের চা'র কোনো তুলনা নেই। পাঁচ বছর আগে সিগারেট ছেড়েছি, এখনো স্মৃতি আছে। কিছুই বলা যায় না— কোনো একদিন সিগারেট ধরে ফেলতে পারি। May be today is the day.

মুহিব ভেবেই পাচ্ছে না বড় ভাইজান আজ এত কথা বলছেন কেন ? টাকা হারানোর শোকে ? টেনশনে একেকজন মানুষ একেক রকম আচরণ করে। মুহিবের মেজো ভাই মোফাজ্জল ঝিম মেরে বিছানায় পড়ে যায়। তার তখন ড্রপ বিট হয়। এবং সে বিড়বিড় করে বলে— Oh God, save me please. তার ধারণা, তার বেহেশত হবে টেনশন ফ্রি একটা জায়গায়। বেহেশতে তার হুরপরী, সরাবন তহুরা কিছুই লাগবে না। শুধু শুয়ে থাকার জন্যে নরম বিছানা লাগবে। শব্দ হয় না এরকম এসি লাগবে। আর লাগবে টেনশন ফ্রি মন।

মোফাজ্জল বারান্দায় তার যমজ দুই মেয়েকে শাস্তি দিতে নিয়ে এসেছে। ক খ দু'জনকে মুখোমুখি বসানো হয়েছে। দু'জনের গালে কষে থাপ্পড় লাগানো হয়েছে। এরা কেউ কাঁদছে না। দু'জন দু'জনের দিকে রাগী চোখে তাকিয়ে আছে। এদের এই এক অদ্ভুত ব্যাপার! যে শাস্তি দেয় এরা তার উপর রাগ করে না। এক বোন অন্য বোনের উপর রাগ করে। ফোঁস ফোঁস করতে থাকে। মুহিব এসে বারান্দায় দাঁড়াল। মোফাজ্জল ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে হুঙ্কার দিয়ে বলল, মুহিব, এক কাজ করতো, এই দুই শয়তানীর গালে কষে দুই থাপ্পড় দে।

মুহিব বলল, কেন ?

প্রশ্ন করবি না। থাপ্পড় দিতে বলছি থাপ্পড় দে।

বলে নিজেই এসে থাপ্পড় দিল। ক উল্টে পড়ে গেল। আবার নিজে নিজেই উঠে বসে খ-এর দিকে তাকিয়ে ফোঁস ফোঁস করতে লাগল। মুহিব নিজের ঘরে ঢুকে গেল। সব বাবা-মা'রই সন্তান পালনের নিজস্ব টেকনিক আছে। এই টেকনিকে বাধা দেয়ার দরকার নেই। সংসার তার নিজস্ব গতিতে চলুক। কেউ বাচ্চাদের থাপ্পড় দিয়ে বড় করবে। আবার কেউ আদর দিয়ে বড় করবে। ফাইনাল প্রোডাক্ট কী হবে তা কেউই জানে না।

মুহিব বিছানায় পা এলিয়ে বসেছে। সারাদিনে সে কী করবে না করবে একটু ভেবে নেয়ার ব্যাপার আছে। সফিক ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। সিরিয়াস কিছু নিশ্চয়ই হয়েছে। সিরিয়াস কিছু না হলে তিনি ভোরবেলায় টেলিফোন করার মানুষই না। দলের কেউ কি মারা গেছে ? সফিক ভাইয়ের মামার বাড়িতে কি কোনো সমস্যা হয়েছে ? পুলিশ এসেছে। পুলিশ তাদের খুঁজছে ? পুলিশ বড় ধরনের কোনো সমস্যা করতে পারবে না। মহসিনের মেজো চাচা পুলিশের ডিআইজি। পুরোপুরি দুই নম্বরি মানুষ। পুলিশের লাইনে দু'নম্বরি মানুষের ক্ষমতা থাকে বেশি। মহসিন যদি সত্যি সত্যি কাউকে খুন করে তার ডিআইজি চাচাকে বলে, চাচা, খুন করে ফেলেছি। উনি বলবেন— কিছু দিনের জন্যে গা ঢাকা দে, ইন্ডিয়া চলে যা। দেখি কী করা যায়।

মহসিনের এই ডিআইজি চাচা অতি ধার্মিক মানুষ। একবার হজ করেছেন, দু'বার উমরা হজ করেছেন। নামাজের কারণে কপালে দাগ পড়ে গেছে। তিনি যখন ডিউটিতে যান আর্দালির সঙ্গে জায়নামাজ থাকে। তাঁর খাকি শার্টের পকেটে থাকে আকিক পাথরের তসবি। ডিউটিতে ফাঁক পেলে তসবি টানেন। মুহিব একবার মহসিনের সঙ্গে তার মেজো চাচার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। তিনি খুব আদর-যত্ন করেছেন। তসবি টানতে টানতে পুলিশি ক্ষমতার অনেক গল্প করেছেন— বুঝলে বাবারা, সব কিছু পুলিশের হাতে। মনে কর B খুন করেছে C-কে । পুলিশ ইচ্ছা করলে A-কে খুনের মামলায় ফাঁসিয়ে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিতে পারে। পুলিশ এমন প্যাঁচ খেলবে যে শেষের দিকে A মনে করবে খুন সে-ই করেছে। হা হা হা। তাহলে একটা ঘটনা বলি শোন, আমি তখন টাঙ্গাইলের এস.পি...

মাগরেবের ওয়াক্ত পর্যন্ত তিনি তাদের একের পর এক গল্প বলে গেলেন। তাদের দু'জনকে উনার ইমামতিতে মাগরেবের নামাজ পড়তে হলো। নামাজের শেষে তিনি এত আবেগের সঙ্গে দোয়া পড়লেন যে মুহিবের চোখ ছলছল করতে লাগল।

মুহিব!

জি ভাবি।

মুহিবের বড়ভাবি দরজার পাশ থেকে তার অতি বিরক্ত মুখ বের করে বললেন— তোমার টেলিফোন এসেছে, ধর। যাকে তাকে নাম্বার দিও না তো। সময়ে অসময়ে টেলিফোন করে, অতি বিরক্ত লাগে।

মুহিব বিছানা থেকে নামতে নামতে বলল, ইলিশ মাছটা পাঠিয়েছিলাম, কেমন ছিল ভাবি ?

ভালো। টাকাটা পুরোটাই খরচ করেছ ? বাচে নি কিছু ? এক হাজার টাকা দিয়েছিলাম, পুরোটা তো লাগার কথা না।

একশ টাকার মতো বেচেছে।

যা বাচে ফেরত দিও। সব সময় চেয়ে টাকা নিতে হবে কেন ? তোমার ভাইয়ের পঞ্চাশ হাজার টাকা যে চুরি গেছে শুনেছ ?

জি।

তোমার ভাই বলছে— সবার বাক্স-প্যাটরা চেক করা হবে। আমি না করেছি, সে শুনছে না। শেষে কার না কার ব্যাগ থেকে টাকা বের হবে, নিজের আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে...

ভাবি, তোমরা কি নিশ্চিত যে আমাদের মধ্যে কেউ নিয়েছে ?

অবশ্যই।

কে নিয়েছে বলে তোমার অনুমান ?

আগে টেলিফোন সেরে আস। তোমার বন্ধু কতক্ষণ টেলিফোন ধরে বসে থাকবে ?

মুহিব টেলিফোন ধরতে গেল। টেলিফোন করেছে সফিক। তার গলা উত্তেজনায় কাঁপছে। অতি দ্রুত কথা বলছে বলে কথাও জড়িয়ে যাচ্ছে।

সকাল থেকে চেষ্টা করছি তোকে ধরার জন্য। এক্ষুণি চলে আয়। টেলিফোন রেখে দৌড় দিয়ে ঘর থেকে বের হবি। লাফ দিয়ে কোনো একটা চলন্ত বেবিটেক্সিতে উঠে পড়বি। স্ট্রেইট আমার বাসায়।

কী হয়েছে ?

পত্রিকা পড়িস নাই ? 'প্রথম আলো'র লাস্ট পেজটা দেখেছিস ?

না।

তোদের বাসায় কী পত্রিকা রাখা হয় ?

জানি না।

'প্রথম আলো'র লাস্ট পেজ-এ হারুনের ছবি ছাপা হয়েছে।

কেন ?

সে প্রেসক্লাবের সামনে গতরাত বারোটা থেকে বসে আছে। ঘোষণা দিয়েছে তার জন্মদিনে অর্থাৎ জুলাইয়ের দুই তারিখে বেকার গায়ে কেরোসিন ঢেলে জীবন বিসর্জন দেবে।

কেন ?

বেকার সমস্যার দিকে জনগণের দৃষ্টি ফেরাবার জন্যে। হারুনের পেটে যে এই জিনিস ছিল কোনোদিন বলেছে ? আশ্চর্য ছেলে! সকালে পত্রিকা দেখে আমার তো ব্রেইন আউলা হয়ে গেল। কোনো রকম আলোচনা নাই, কিছু নাই, হুট করে এত বড় ডিসিশান! যাই হোক, এখন পুরো দায়িত্ব আমাদের নিতে হবে। কবি-সাহিত্যিক, অভিনেতা, গায়ক, বুদ্ধিজীবী সবার কাছে ছোটাছুটি করতে হবে। সিরিয়াস জনমত তৈরি করতে হবে। আমাদের দলের সবাইকে এক হাজার টাকা করে চাঁদা দিতে হবে। অনেক খরচাপাতির ব্যাপার আছে। একটা পোস্টার ছাপাতে হবে। নীরব ঘাতক সাবেরের মামার প্রেস আছে। সাবেরকে সঙ্গে নিয়ে উনার পায়ে পড়ব। বলব, মামা আপনার পায়ে ধরলাম। রাজি না হওয়া পর্যন্ত পা ছাড়ব না। আমরা কাগজ কিনে দিচ্ছি, আপনি চার কালারের একটা পোস্টার ছেপে দিন। হারুনের সুন্দর একটা ছবিও তুলতে হবে। হতাশ চেহারা বড় বড় চোখে তাকিয়ে আছে টাইপ। তোর চেনাজানা কোনো ফটোগ্রাফার আছে ?

না।

ফট করে না বলিস না। চিন্তা করে বল। ভালোমতো চিন্তা করলে দেখবি কেউ না কেউ বের হয়ে পড়েছে। এক হাজার টাকা ম্যানেজ করে চলে আয়। এক হাজার টাকা হলো মিনিমাম। যত বেশি হয় তত ভালো। কথা বলে সময় নষ্ট করিস না। দৌড় দিয়ে ঘর থেকে বের হ।

টাকার জন্যে মুহিব গেল মনোয়ারার কাছে। তিনি অবাক হয়ে বললেন, তোর কত টাকা লাগবে বললি ?

পাঁচ হাজার।

এত টাকা দিয়ে তুই কী করবি ?

আমার এক বন্ধুর চিকিৎসার জন্যে দরকার। সে মারা যাচ্ছে।

তোর কি মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেছে ? বন্ধুর চিকিৎসার জন্যে পাঁচ হাজার টাকা ? টাকা সস্তা হয়ে গেছে!

মা প্লিজ ব্যবস্থা কর। এখন ধার হিসাবে নিচ্ছি। পাই পয়সা হিসাব করে টাকা ফেরত দেব।

আমি টাকা পাব কোথায় ?

ভাইয়ার বান্ডিলটা থেকে দাও। তুমি তো মাত্র পাঁচশ খরচ করেছ। বাকিটা তো আছে। এবং এই টাকাটা ভাইজানকে ফেরত দিতে হবে। কোনোই কাজে লাগবে না। মাঝখান থেকে আমার বন্ধুর জীবন রক্ষা হয়।

মনোয়ারা ক্ষিপ্ত গলায় বললেন, তোর এত বড় সাহস! তুই তো মানুষ না। তুই জানোয়ার। নিজের মাকে চোর বলছিস। তোর স্থান দোজখেও হবে না।

চুরি করেছ বলেই তো বলেছি। তুমি স্বীকারও করেছ। না স্বীকার করলে বেনিফিট অব ডাউট দেয়া যেত।

চুপ হারামজাদা।

মা একটা কিছু ব্যবস্থা কর। পাঁচ হাজার না পার, চার হাজার, চার না পার তিন...

তুই আমার সামনে থেকে যা। জীবনে আমার সামনে পড়বি না। আমি বাকি জীবন তোর মুখ দেখতে চাই না।

মা শোন, বড় ভাবির সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। উনার ভাবভঙ্গি সুবিধার না। মনে হয় স্যুটকেস-ট্রাঙ্ক সত্যি সত্যি খোলা হবে। তুমি অবশ্যই আমার ড্রয়ারে রেখে দিও। আগে মান-সম্মানটা বাঁচুক।

আমার সামনে থেকে যা। কোনোদিন আমার সামনে পড়বি না। কোনোদিন না। আমি বাকি জীবনে তোর মুখ দেখতে চাই না।

হারুন বসেছে প্রেসক্লাবের গেট থেকে একটু দূরে। শতরঞ্জি বিছিয়ে বসেছে। তার ডান পাশে ধবধবে সাদা রঙের বিশাল বালিশ। সামনে পিরিচে গুড়মুড়ি এবং ছোট এলাচ দানা রাখা। তার পেছনে বাঁশ পুতে বাঁশের মাথায় ছাতি দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়েছে। ছাতার ছায়া হারুনের মাথায় পড়ে নি। ঘাড়ের উপর পড়েছে। হারুনের পেছনে নীল রঙের প্লাস্টিকের চেয়ার। সফিক চেয়ারগুলি দু'দিনের জন্যে ডেকোরেটরের দোকান থেকে ভাড়া করে এনেছে। চেয়ারগুলি গোল করে বসানো। সেখানে সফিকের বন্ধুরা গম্ভীর ভঙ্গিতে বসা আছে। একটা বাচ্চা চাওয়ালাকে খবর দিয়ে আনা হয়েছে। তার সঙ্গে কন্ট্রাক্ট— সারাদিন সে সফিকের দলকে চা খাওয়াবে। বাইরে চা বিক্রি করতে পারবে না। বিনিময়ে চায়ের দাম তো পাবেই, এক্সট্রা পঞ্চাশ টাকা পাবে। চাওয়ালার নাম— জতু। জতু অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে প্রস্তাবে রাজি হয়েছে। সে নিজেকে দলের অংশ হিসেবে ভাবছে। যেন সে এখন এক বিরাট জাতীয় কর্মকাণ্ডের অংশ। গুরুত্বপূর্ণ সদস্য।

সফিক তার দল নিয়ে চেয়ারে গোল হয়ে বসেছে। তাদের সবার হাতে চায়ের কাপ। তারা মাথা নিচু করে অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে একমত হবার চেষ্টা করছে। কোনো ইস্যুতেই কেউ একমত হতে পারছে না। সবারই মেজাজ খারাপ হচ্ছে। হারুনের সামনে একটা পোস্টার লাগানো হবে— এই বিষয়ে সবাই একমত। পোস্টারের লেখা তৈয়ব লিখেছে। লেখাটার বিষয়েও

সবাই একমত। তৈয়ব ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র। তার তিনটা ছোটগল্প পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। সে খারাপ লিখবে না। লেখাটা ভালো হয়েছে। সমস্যা হলো পোস্টারটা হাতে লেখা হবে না কম্পিউটারে কম্পোজ করে সেঁটে দেয়া হবে সেটা নিয়ে। একদল বলছে, হাতে লেখা উচিত। হাতে লেখার মধ্যে একটা পার্সোনাল টাচ থাকে। ব্যাপারটা রিয়েলিস্টিকও হবে। বেকার মানুষ কম্পিউটার কম্পোজের টাকা পাবে কোথায়? আরেক দলের ধারণা কম্পিউটার কম্পোজ হওয়া উচিত। পোস্টার একটা থাকবে না, কয়েকটা থাকবে। হাতের লেখা পোস্টারের চেয়ে কম্পিউটার কম্পোজ ভালো। হার্ড ফ্যাক্ট গোটা গোটা হরফে লেখা থাকবে। কোনো কেলিওগ্রাফি না। বাস্তব সত্য। লেখাটা হলো—

> আমার নাম হারুন-অর-রশিদ। না, আমি বাগদাদের খলিফা হারুন-অর-রশিদ না। আমি বেকার হারুন। গত পাঁচ বছর অনেক চেষ্টা করেও কোনো ব্যবস্থা করতে পারছি না। জীবনের প্রতি তীব্র ঘৃণা জন্মে গেছে। আমি প্রতিবাদ হিসেবে গায়ে আগুন জ্বেলে আত্মাহুতি দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমার মৃত্যুতে কারোরই কিছু যাবে আসবে না। তাহলে কাজটা কেন করছি? প্রতিবাদ জানানোর জন্যে করছি। এ দেশের মানুষদের বেকার সমস্যার ভয়াবহতার দিকে দৃষ্টি ফেরাবার জন্যে করছি। হয়তো একটি প্রাণের বিনিময়ে হলেও সবাইকে একটা খবর পৌঁছাতে পারব। আমার মতো হাজার হাজার যুবকের অবস্থার দিকে একটু নজর দিন। একটু ভাবুন। আত্মাহুতির তারিখ ২ জুলাই, রাত বারোটা এক মিনিট। আপনার যদি কাজ না থাকে, চলে আসুন প্রেসক্লাবের সামনে।

আত্মাহুতির সময়টা নিয়েও মতভেদ তৈরি হয়েছে। একদল বলছে, রাত বারোটা এক মিনিট ভালো সময়। মধ্যরাত। একটি দিনের শেষ, আরেকটা দিনের শুরু। আরেকদল বলছে— রাত বারোটা এক মিনিটে ঘটনা ঘটলে পত্রিকায় নিউজ ধরানো যাবে না। পত্রিকায় নিউজ ধরাতে হলে— সন্ধ্যা ছ'টার মধ্যে কার্য সমাধা করতে হবে।

এক পর্যায়ে সফিক মহাক্ষিপ্ত হয়ে বলল, আমার ধারণা তোদের সবার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। হারুনকে তো আমরা সত্যি সত্যি আগুনে পুড়তে দেব না। কাজেই রাত বারোটা এক মিনিটও যা, রাত তিনটাও তা। তোরা এমনভাবে কথা বলছিস যেন সে সত্যি সত্যি গায়ে আগুন দেবে। আমরা কাজটা করছি

মিডিয়া অ্যাটেনশনের জন্যে। কাজেই রাত বারোটা এক মিনিট ফাইনাল। এই বিষয়ে আর কথা হবে না। এখন মূল বিষয়ে চলে আয়, আমরা হারুনের পাশে কেরোসিনের টিন, দেয়াশলাই এইসব রাখব কিনা।

তৈয়ব বলল, না। এতে ব্যাপারটা হাস্যকর হয়ে যাবে। মনে হবে আমরা ড্রামা তৈরির চেষ্টা করছি।

সফিক বলল, ড্রামা তো করতেই হবে। পাবলিসিটির জন্য ড্রামা দরকার। যারা হারুনকে দেখতে আসবে তারা ধাক্কার মতো খাবে। যে আগুন দিয়ে নিজেকে পুড়াতে চাচ্ছে সে শুধু মুখের কথা বলছে না, একটিন কেরোসিন পর্যন্ত কিনে এনেছে।...

আলোচনা হৈচৈ তর্ক বিতর্ক। কোনো কিছুতেই হারুনের মন নেই। সে মোটামুটি মূর্তির মতোই বসে আছে। তাকে সিগারেট দেয়া হয়েছিল। সে বলেছে— না।

মহসিন বলেছে, সিগারেট খেতে সমস্যা কোথায় ? তুই তো অনশন করছিস না। আগুন দিয়ে নিজেকে পুড়িয়ে কয়লা বানিয়ে ফেলবি। সেই ঘটনা যখন ঘটার কথা তখন ঘটবে। ঘটনা ঘটার আগে তুই তোর ইচ্ছামতো খাওয়া দাওয়া করবি। চা দিয়ে একটা সিগারেট খা।

না।

তুই আমাদের সঙ্গে রেগে রেগে কথা বলছিস কেন ? আমরা কী করলাম ?

হারুন চুপ করে আছে। মহসিন বলল, তোর কি জ্বর না-কি ? চোখ লাল।

তারও কোনো জবাব নেই।

হারুনের ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না। এমন কী ঘটনা ঘটল যে গায়ে আগুন জ্বালিয়ে দিতে হবে ? কোনো মেয়ের সঙ্গে প্রেম-ফ্রেম থাকলে চিত্ত তরল থাকে। হঠাৎ হঠাৎ উদ্ভট কিছু করতে ইচ্ছে করে। হারুনের এরকম কিছুও নেই। বিয়েও করে নি যে বেকার স্বামীকে নিয়ে স্ত্রী ঘ্যানঘ্যান প্যানপ্যান করছে। তার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে শ্বশুরবাড়ির জ্ঞানী লোকজন। বেকারদের দলে হারুনের অবস্থা ভালো। সে তার নিজের বাড়িতে থাকে। তার আলাদা ঘর আছে। হারুনের বাবা রিটায়ার্ড এসপি। 'মাই ডিয়ার' টাইপ মানুষ। হারুনের কোনো বন্ধু-বান্ধব বাড়িতে উপস্থিত হলে তিনি চোখ সরু করে তাকান না। বরং হাসি মুখে বলেন— এসো এসো। বলো দেখি কী খবর। ইয়াং ম্যানদের দেখলেই শরীরে কেমন যেন ইয়াং ভাব চলে আসে। বৃদ্ধদের এই কারণেই সবচে' বেশি সময় কাটানো উচিত তরুণদের সঙ্গে। সেটা কখনো হয়ে উঠে না। তরুণরা বৃদ্ধ পছন্দ করে না।

বেকার তরুণদের মধ্যে হারুন হয়তোবা অতি অল্প কিছু ভাগ্যবানদের একজন যার জন্মদিন পালন করা হয়। আত্মীয়স্বজনরা বাড়িতে গিজগিজ করতে থাকে। বাইরের বাবুর্চি এসে মোরগ-পোলাও রান্না করে। হারুনের বাবা অত্যন্ত আনন্দিত ভঙ্গিতে ইস্ত্রি করা পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে ঘোরাঘুরি করেন। সুযোগ পেলেই ছোটবেলায় হারুন কেমন ছিল, কী করত খুবই আগ্রহের সঙ্গে সেই গল্প করেন— হারুনকে নিয়ে আমি একটা ছড়া বানিয়েছিলাম। ছড়াটা বললেই ক্ষেপে যেত। কান্নাকাটি। ভাত খাওয়া বন্ধ টাইপ ক্ষেপা। অথচ খুবই নির্দোষ ছড়া—

'হারুন
ঘাড় ধরে মারুন।
চড় থাপ্পর কিল ও ঘুসি
মার খেলেই হারুন খুশি।'

প্রতি জন্মদিনে এই ছড়াটা আমি একবার করে বলি এবং তার রি-অ্যাকশন লক্ষ করি। আট বছর পর্যন্ত সে কাঁদত। আট বছর থেকে বারো বছর পর্যন্ত রেগে যেত। আমাকে মারতে আসত। বারো'র পর থেকে বিরক্ত হওয়া শুরু করেছে।

এ ধরনের পারিবারিক অবস্থার একটি ছেলে হঠাৎ একদিন বলবে— 'গায়ে আগুন জ্বালিয়ে দিব'— তা হয় না। কোথাও কোনো একটা সমস্যা হয়েছে। সমস্যাটা বোঝা যাচ্ছে না।

মুহিবের উপর দায়িত্ব পড়েছে— শো-বিজনেসের লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করা। তারা যেন একবার এসে এক মিনিটের জন্যে হলেও হারুনকে দেখে যান। বিবৃতি দেন— 'আমরা পাশে আছি। হারুনের জন্যে আমাদের সহানুভূতি আছে।' মুহিবের হাতে বিশাল এক তালিকা ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। সেখানে ফিল্মের লোক আছে, নাটকের লোক আছে, গানের শিল্পীরা আছে। এদের মধ্যে মুহিব চেনে মাত্র চারজনকে। নোরাকে চেনে। সে গায়িকা এবং তার যথেষ্টই নামডাক আছে। নোরাকে বুঝিয়ে বললে সে শুধু যে আসবে তা না, হারুনের পাশে সারাদিন বসে থাকতে বললে সারাদিন বসে থাকবে।

নোরা যেহেতু গান করে সে নিশ্চয়ই অন্য গানের শিল্পীদেরও চেনে। তার মাধ্যমে অন্যদের কাছে যাওয়া। পাখি দিয়ে পাখি শিকার।

নাটকের লোকজনদের মধ্যে জাহিদ হাসানের এক ফুপাতো ভাইয়ের সঙ্গে পরিচয় আছে। তাকে নিয়ে বাসায় যাওয়া যাবে। ভাগ্য ভালো হলে জাহিদ হাসানের স্ত্রী মৌ বাসায় থাকবেন। দু'জনকেই বলা যাবে। মেয়েদের মন নরম

টাইপ হয়, মৌ ভাবি হয়তো বা রাজি হয়ে যাবেন কিছুক্ষণের জন্যে আসতে। নাটকের আরেকজন শিল্পীর বাসায় মুহিব একবার গেছে। শীলা আহমেদ। তাকে বললে সে অবশ্যই রাজি হবে। তবে মেয়েটা এখন নাটক ছেড়ে দিয়েছে। নাটক ছেড়ে দিলেও লোকজন তাকে চিনে। এখন নিশ্চয়ই বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নিয়ে যাবার জন্যে লোকজন তার পেছনে লেগে থাকে না। সেখানে হঠাৎ একজন কেউ উপস্থিত হলে খুশিতেই রাজি হয়ে যাবার কথা।

একটা গাড়ির ব্যবস্থা রাখতে হবে। কেউ রাজি হলো, সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি গিয়ে তাকে নিয়ে এলো। নোরাদের তিনটা গাড়ি। দু'জন ড্রাইভার। একটা গাড়ি কখনো ব্যবহারই করা হয় না। গাড়ি চাইলে নোরা কি দেবে ? দেয়ার তো কথা।

মুহিব নোরার বাড়ির দিকে রওনা হলো। এগারোটা বাজে। নোরাকে বাড়িতে পাওয়ার সম্ভাবনা একশ দশ ভাগ। নোরা রাত তিনটা সাড়ে তিনটার দিকে ঘুমুতে যায়। এগারোটার আগে সে ঘুম থেকেই উঠে না। ইউনিভার্সিটি খোলা থাকলেও না। সকালের সব ক্লাস তার মিস যায়। এখন ইউনিভার্সিটি বন্ধ। এগারোটার আগে ঘুম থেকে উঠার তার প্রশ্নই আসে না। নোরার বাবা কি বাসায় আছেন ? ভদ্রলোকের পায়জামা-পাঞ্জাবিটা নিয়ে এলে হতো। ধোপাখানায় দিয়ে ইস্ত্রি করে রাখা উচিত ছিল।

নোরা বাড়িতে আছে। ঘুম থেকে উঠেছে অনেক আগে। সাজসজ্জা দেখে মনে হচ্ছে এক্ষুণি বের হবে। মুহিব কিছু বলার আগেই নোরা বলল, তুমি হাতে সময় নিয়ে এসেছ তো ?

মুহিব বলল, হ্যাঁ।

মিনিমাম দু'ঘন্টার জন্যে তুমি কিন্তু আটকা পড়ে গেলে। তুমি খুবই ভুল সময়ে এসেছ।

মুহিব কথার পিঠে সুন্দর কোনো কথা বলার চেষ্টা করল। কোনো কিছুই মনে আসছে না। এদিকে সফিকের কোনো তুলনা নেই। কথার পিঠে কথা সফিকের মতো সুন্দর করে কেউ বলতে পারে না।

চা খাবে না কফি খাবে ?

চা।

নোরা বলল, চা না কফি খাও। কারণ আমার কফি খেতে ইচ্ছা করছে।

আচ্ছা কফি দাও।

আমার ঘরে চলে এসো। ঘর খুবই এলোমেলো। তাতে নিশ্চয়ই তোমার সমস্যা হবে না। আমি মাঝে মাঝে ঘর খুব গুছিয়ে রাখি। মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে ঘর এলোমেলো করে রাখি। তুমি এসেছ এলোমেলো সময়ে।

মুহিব মনে মনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। তুমি এসেছ এলোমেলো সময়ে। কী সুন্দর কথা! এই কথার পিঠে যদি এরচে'ও সুন্দর কোনো কথা বলা যেত! যখন মুহিব মোটামুটি ইন্টারেস্টিং একটা সেনটেন্স মনে মনে গুছিয়ে এনেছে তখনই নোরা বলল, তুমি কি কোনো কাজে এসেছ না সৌজন্য সাক্ষাৎ?

কাজে এসেছি। তুমি কি বাংলাদেশের গায়ক-গায়িকাদের চেন?

চিনব না কেন! অবশ্যই চিনি।

তাদের সঙ্গে কি তোমার খাতির আছে? তুমি কোনো কথা বললে কি তারা রাখবে?

রাখবে না। কারণ আমি তাদের কাউকেই সহ্য করতে পারি না। ওরাও আমাকে সহ্য করতে পারে না। ওদের ধারণা আমি গান গাইতে পারি না। আমার গলায় সুর নেই। অকারণেই আমাকে নিয়ে মাতামাতি হয়। আর আমার ধারণা, ওরা কেউ ঠিকমতো গাইতে পারে না। ওদের গলায় সবই আছে, মমতা নেই। তোমার কি গায়ক-গায়িকা দরকার? কোনো ফাংশনে গান গাইতে হবে?

তা না।

অল্প কথায় গুছিয়ে বলতে পারলে বলো। আমি তোমাকে আমার ঘরে বসিয়ে রেখে গোসলে ঢুকব। আমার গোসল সারতে এক ঘণ্টা লাগে। এক ঘণ্টা পরে তোমাকে নিয়ে একটা এক্সপেরিমেন্ট করব। দু'ঘণ্টা শেষ। তুমি তোমার কাজে চলে যেতে পারবে।

মুহিব হারুনের ব্যাপারটা বলল। একটু বাড়িয়েই বলল— যেমন হারুন নিজেই এক টিন কেরোসিন কিনে এনেছে। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এখন মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে।

নোরা বলল, তোমার ঐ বন্ধু তো মানসিকভাবে অসুস্থ। গায়ক-গায়িকা জোগাড় না করে তাকে বরং কোনো মানসিক ডাক্তার দেখাও। সবচে' ভালো কী জান কোনো হিপনোটিস্ট দিয়ে তাকে হিপনোটাইজ করে সাজেশান দেয়া। হিপনোটাইজ করাটা যদি আমি ভালোমতো শিখতে পারতাম তাহলে আমি নিজেই করতাম। আমি অনেককে নিয়ে চেষ্টা করেছি। আমার সাকসেস রেন্ট অনলি টুয়েন্টি পারসেন্ট। তুমি কি কাউকে হিপনোটাইজড হতে দেখেছ?

না।

খুবই ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। তোমাকে নিয়ে একটা এক্সপেরিমেন্ট করব বলছিলাম না? হিপনোসিস নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট। তোমার আপত্তি নেই তো?

না।

রিলাক্সড হয়ে বসো। কোনোরকম টেনশন করবে না। টেনশন করার কিছু নেই।

মুহিব রিলাক্সড হয়েই বসে আছে। সে যে ঘরে বসে আছে সেটা নোরার শোবার ঘর। নোরার খুবই ব্যক্তিগত একটা জায়গা। সে বসেছে হালকা সবুজ রঙের নিচু একটা সোফায়। সোফাটা নোরার বিছানার সঙ্গে লাগানো। বিছানার চাদর এবং সোফা মনে হয় একই কাপড় দিয়ে বানানো। ঘরের পর্দাগুলির রঙও সবুজ। ধবধবে শাদা মার্বেলের মেঝে। মাঝখানে গাঢ় লাল রঙের কার্পেট। ঘরটায় রঙ ঝলমল করছে অথচ কোনো রঙ চোখে লাগছে না।

নোরা বাথরুমে ঢুকে গেছে। শোবার ঘরের সঙ্গে লাগানো বাথরুম। মুহিব যেখানে বসেছে সেখান থেকে বাথরুমের দরজা দেখা যায়। দরজার দিকে তাকিয়ে থাকতে মুহিবের লজ্জা লাগছে বলে সে অন্যদিকে তাকিয়ে আছে। শাওয়ার দিয়ে পানি ঝরার শব্দ কানে আসছে। সেই শব্দের সঙ্গে গলা মিলিয়ে মাঝে মাঝেই নোরা ঝিনিনি ঝিনিনি নি...র মতো সুর করছে। শুনতে এত অদ্ভুত লাগে! বাথরুমের ভেতর থেকে সে মাঝে মাঝে মুহিবের সঙ্গে কথা বলছে। কথাগুলি শোনাচ্ছে অদ্ভুত। মনে হচ্ছে অনেক দূর থেকে অন্য কেউ কথা বলছে...

একা একা বোর হচ্ছ ?

না।

আমার ঘরে অনেক ম্যাগাজিন আছে। যে-কোনো একটা ম্যাগাজিন নিয়ে পাতা উল্টাও, সময় কেটে যাবে।

দরকার নেই।

সময় কাটাবার খুব ভালো বুদ্ধি কী জানো ?

না।

সময় কাটাবার সবচে' ভালো বুদ্ধি মানুষকে যে প্রাণীটা দিয়েছে তার নাম গরু, The cow. জানো ব্যাপারটা ?

না।

গরু কী করে ? জাবর কাটে। সময় কাটাবার জন্যে মানুষ এই কাজটা করতে পারে। কাজটা একটু অন্যভাবে করতে হবে। স্মৃতির জাবর কাটতে হবে। কোনো একটা ইন্টারেস্টিং স্মৃতি নিয়ে জাবর কাটা। আমি এই কাজটা প্রায়ই করি। এখন আমি কী করছি অনুমান করতে পার ?

না।

বাথটাব ভর্তি পানি। আমি গলা ডুবিয়ে পানিতে শুয়ে আছি। আমার হাতে একটা জ্বলন্ত সিগারেট।

তুমি কি এখন নিয়মিত সিগারেট খাচ্ছ ?

তা খাচ্ছি। দিনে এক প্যাকেটের বেশি শেষ হচ্ছে। তবে খুব শিগগিরই ছেড়ে দিব। আমি কোনো কিছুই বেশিদিন ধরে রাখি না। বেশির ভাগ মানুষের স্বভাব পুরনো জিনিস ধরে রাখা। মানুষ কিছুই ফেলতে পারে না। এই জন্যে মানুষকে বলা হয় The collector. আমি অনেকক্ষণ কথা বললাম। এখন কথা বন্ধ। আমি মেডিটেশনে যাচ্ছি। গোসল করতে আমার দেরি হয় এই কারণে। আমি আধঘণ্টার মতো মেডিটেশন করি। পানিতে শবাসন হয়ে শুয়ে থাকি। মাথা থেকে সব চিন্তা-ভাবনা দূর করে দেই।

মুহিব ঝিম ধরে চেয়ারে বসে আছে। বাথরুম থেকে কোনো শব্দ আসছে না। মুহিবের ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। সোফাটাকে খুবই আরামদায়ক মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, এই সোফা তৈরি হয়েছে ঘুমুবার জন্যে। সে চেষ্টা করছে জেগে থাকার জন্যে। কিন্তু জেগে থাকতে পারছে না। চোখের পাতা ভারী।

তার ঘুম ভাঙল। চায়ের কাপে চামচের শব্দ শুনে। চোখ মেলে দেখে নোরা কার্পেটে বসে আছে। তার হাতে কফির কাপ। কফির পোড়া পোড়া গন্ধে ঘর ম ম করছে।

নোরা বলল, তুমি কতক্ষণ ঘুমিয়েছ জানো ?

মুহিব বলল, না।

আমি বাথরুম থেকে বের হয়ে দেখি তুমি ঘুমাচ্ছ। কাজেই তোমাকে আর জাগাই নি। তুমি তেতাল্লিশ মিনিট ধরে ঘুমাচ্ছ। গভীর ঘুম।

সরি।

সরি কেন ? সরি বলার মতো কোনো কাণ্ড তুমি কর নি। তবে আমার পরিকল্পনা নষ্ট করে দিয়েছ। তোমার উপর আজ কোনো হিপনোসিস প্রক্রিয়া চালানো যাবে না। যে মানুষ গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠেছে তাকে হিপনোটাইজ করা যায় না। আরেক দিন হাতে সময় নিয়ে চলে এসো।

কবে আসব ?

যে-কোনোদিন। সন্ধ্যার পরে এসো।

আজ সন্ধ্যায় আসব ?

আজ না। আজ আমি বাড়িতে থাকব না।

মুহিব মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে। এইমাত্র গোসল করার কারণেই হোক বা যে-কোনো কারণেই হোক কী সুন্দর যে মেয়েটাকে লাগছে! হালকা গোলাপি

রঙের একটা টাওয়েল দিয়ে নোরা মাথার চুল ঢেকে রেখেছে। টাওয়েলটাকে মনে হচ্ছে নোরার শরীরের অংশ।

নোরা কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে বলল, তোমার ভাব-ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে তুমি আবারও ঘুমিয়ে পড়ছ। তোমার চোখ ছোট হয়ে আসছে। দয়া করে এখন বিদেয় হও। গাড়ি নিয়ে যাও। তুমি যেখানে যেতে চাও গাড়ি তোমাকে নিয়ে যাবে।

সত্যি সত্যি মুহিবের ঘুম পাচ্ছে। তার কোথাও যেতে ইচ্ছা করছে না। সোফাতে হেলান দিয়ে এই ঘরেই ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছা করছে। মুহিব অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়াল। নোরা বলল, তোমার যে বন্ধু Death Wish করছে আমি আজ দিনের মধ্যে কোনো এক সময় তাকে গিয়ে দেখে আসব।

মুহিব বলল, আমি কি তোমার গাড়িটা আজ সারাদিন আমার সঙ্গে রাখতে পারি ?

পার। আমি ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছি।

মুহিব মুগ্ধ চোখে নোরার দিকে তাকিয়ে আছে। যে লাল কার্পেটের উপর নোরা বসে আছে সেই কার্পেটটাকেও মুহিবের এখন নোরার শরীরের অংশ বলে মনে হচ্ছে। এরকম হচ্ছে কেন ?

হারুন কুণ্ডুলি পাকিয়ে শুয়ে আছে। বাঁশের আগা থেকে ছাতা নামিয়ে তার মুখের উপর ধরা হয়েছে রোদ আটকাবার জন্যে। চাওয়ালা জতু মিয়া হারুনের মাথার চুলে বিলি করে দিচ্ছে। হারুনের পায়ের কাছে কেরোসিনের টিন এবং টিনের পাশে পিরিচে চারটা দেয়াশলাই। কেরোসিনের টিন এবং দেয়াশলাইয়ের মাহাত্ম্য কেউ বুঝতে পারছে না, কারণ পোস্টার এখনো লাগানো হয় নি। তারপরেও পথচারীদের কেউ কেউ কৌতূহলী হয়ে তাকে দেখছে। হারুনের কাছ থেকে দশ-বার গজ দূরে গাছের ছায়ায় সফিক একা বসে সিগারেট টানছে। তার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে মেজাজ খুব খারাপ।

মুহিব সফিকের দিকে এগিয়ে গেল। সফিক বলল, ওদের কাণ্ডজ্ঞান দেখেছিস আড়াইটা বাজে কারো কোনো খোঁজ নেই! খাওয়া-দাওয়া তো করতে হবে।

মুহিব বলল, এখনো খান নি ?

সফিক রাগী গলায় বলল, খাব কীভাবে ? ফাইভস্টার থেকে খাওয়া আসবে। পকেটে শেষ সম্বল ষাইট টাকা ছিল— এক প্যাকেট বেনসন কিনে ফেলেছি। তুই খেয়েছিস ?

মুহিব বলল, না।

সফিকের রাগ সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল।

মুহিব বলল, আমি আপনাদের জন্যে খাবার নিয়ে আসি।

কোত্থেকে আনবি ?

আমার চেনা একটা রেস্টুরেন্ট আছে।

বাকি দেয় ?

হ্যাঁ, দেয়।

তাহলে এক কাজ কর, আট-দশ জনের মতো খাবার নিয়ে আয়। পরে দেখা যাবে সবাই এক এক করে উদয় হচ্ছে কেউ খেয়ে আসে নি। হারুনের জন্যে এক বাটি স্যুপ আনতে পারবি ? ওর তো জ্বর এসেছে। ভালো জ্বর। একটা থার্মোমিটারও নিয়ে আসিস। সঙ্গে ভাংতি টাকা-পয়সা আছে ?

আছে।

দু'টাকার বাদাম কিনে দিয়ে যা। বাদাম খেয়ে আগে ক্ষিধাটা নষ্ট করি। নাড়িভুঁড়ি হজম হয়ে গেছে। এখন পেটের চামড়া হজম হওয়া শুরু হয়েছে।

মুহিব গরম সিঙাড়া এবং ডালপুরি কিনে আনল। সঙ্গে তেঁতুলের চাটনি। পেঁয়াজ কাটা কাঁচামরিচ। সিঙাড়া এত গরম যে জিভ পুড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। সফিক আনন্দিত গলায় বলল, এত কিছু আনার তো দরকার ছিল না। চট করে কিছু মুখে দিয়ে কাজে বের হয়ে যা। এক সেকেন্ডও সময় নষ্ট করা যাবে না। বিভিন্ন জায়গায় যে যাবি রিকশা ভাড়া আছে ?

আমার সঙ্গে গাড়ি আছে।

গাড়ি আছে মানে ? কার গাড়ি ?

গান করেন যে নোরা উনার গাড়ি।

বলিস কী! গাড়ি ম্যানেজ করলি কীভাবে ?

হারুনের ব্যাপারটা বললাম। বিভিন্ন জায়গায় যেতে হবে। এইসব শুনে...

সফিক আনন্দিত গলায় বলল, ভালো ম্যানেজ করেছিস তো। উনি আসবেন না ?

বলেছেন আসবেন।

কবে আসবেন ?

আজই আসার কথা।

বলিস কী! পাবলিক অপিনিয়ন তো দেখি এখনই তৈরি হওয়া শুরু হয়েছে। নোরার মতো গায়িকার দেখতে আসা সহজ ব্যাপার না। একজন স্টিল

ফটোগ্রাফার সার্বক্ষণিকভাবে থাকা দরকার, সেলিব্রিটি কেউ আসল, ঝপাঝপ ছবি। তোর বাসায় ক্যামেরা আছে ?

বড় ভাইজানের আছে। দিবে না।

চেষ্টা করতে তো ক্ষতি নেই। চেষ্টা না করেই যদি বলে ফেলিস দিবে না তাহলে হবে কীভাবে ? সব কাজ বাদ দিয়ে বাসায় যা, তোর ভাইকে ভজিয়ে ভাজিয়ে ক্যামেরা নিয়ে চলে আয়। নোরা ম্যাডাম যদি সত্যি আসেন তাহলে অবশ্যই ছবি তুলতে হবে। উনার সঙ্গে তোর পরিচয় কেমন ?

সামান্য পরিচয়।

সামান্য পরিচয়ই খাবলা-খাবলি করে বড় করতে হবে। কখন কী কাজে লাগে কিছুই বলা যায় না। ও ভালো কথা! তোকে বলতে ভুলে গেছি— আমার মামার বাড়ির ত্রিসীমানায় যাবি না। ঐ এলাকা আমাদের গ্রুপ মেম্বার সবার জন্যেই আউট অব বাউন্ড। তোর জন্যে বিশেষ করে আউট অব বাউন্ড।

মুহিব অবাক হয়ে বলল, কেন ?

সফিক বিরক্ত হয়ে বলল, সবাই মিলে নির্দোষ একটা মানুষকে সিঁড়ি দিয়ে নেংটো করে দৌড় দেয়াবি আর তার কনসিকোয়েন্স চিন্তা করবি না ?

ঘটনা কী হয়েছে বলেন। থানায় কেইস করেছে ?

কেইস করলে তো কোনো ব্যাপার ছিল না। কেইস টেইস কিছু না। আরজু সাহেবের ব্রেইন ঐ ঘটনার পর থেকে শর্ট সার্কিট হয়ে গেছে। কাউকে চিনতে টিনতে পারেন না। ভ্যাবলার মতো তাকিয়ে থাকেন। আরজু সাহেবের এক মেয়ে আছে। যতদূর জানি যুথী নাম। ঐ মেয়ে তোকে পাগলের মতো খুঁজছে।

আমাকে খুঁজছে কেন ?

তোকেই তো খুঁজবে। তুই আরজু সাহেবকে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে এলি। নিজের নামও বলে এসেছিস। এই সব ক্ষেত্রে সবসময় ফলস্ নাম দিতে হয়। যাই হোক, এত দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই। সামান্য কাপড় খুলাতেই যে পাগল হয়ে গেছে তার মধ্যে পাগলামি আগে থেকেই ছিল। দু'দিন পর আপনা-আপনি পাগল হতো। এখন দোষ পড়েছে আমাদের ঘাড়ে। দাঁড়িয়ে থেকে সময় নষ্ট করিস না। ক্যামেরা আনার ব্যবস্থা কর।

বাড়ির ভেতরের দিকের উঠোনে ক এবং খ পা ঝুলিয়ে বসে আছে। দু'জনের মুখই অসম্ভব গম্ভীর। মুহিবকে ঢুকতে দেখে দু'জনই একসঙ্গে মুখ তুলে তাকাল এবং মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে হাসতে লাগল। লক্ষণ মোটেই ভালো না। এই দু'বোন

যখন একসঙ্গে কারো দিকে তাকিয়ে হাসে তখন বুঝতে হবে তার কোনো খারাপ খবর আছে। মুহিব বলল, তোদের খবর কী রে ?

দু'জন একসঙ্গে বলল, ভা-া-া-া-লো।

বিকেলের মার খেয়েছিস ?

দু'জন একসঙ্গে হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। তাদের মুখের হাসি মুছে গেল না।

বাড়ির পরিস্থিতি অস্বাভাবিক এটা মুহিব বুঝতে পারছে। মুহিবের মন বলছে পঞ্চাশ হাজার টাকার ঘটনা কোনো একটা ক্লাইমেক্সে পৌছেছে। মুহিব বলল, মা কই জানিস ?

ক বলল, চলে গেছে ।

খ মাথা দুলিয়ে হেসেই যাচ্ছে। উঠানের শেষ প্রান্তে নতুন কাজের মেয়েটা আনারস কাটছে। আসরের নামাজের পর বড়চাচা সিজনাল ফ্রুটস খান। আমের সময় আম। আনারসের সময় আনারস। কাজের মেয়েটা আনারস কাটা বন্ধ করে এক দৃষ্টিতে মুহিবের দিকে তাকিয়ে আছে। মুহিবের চোখে চোখ পড়তেই সে অতি দ্রুত চোখ নামিয়ে নিল। আনারস কাটায় অতিরিক্ত মনোযোগী হয়ে গেল। ক খ এর হাসি এবং কাজের মেয়েটির কর্মকাণ্ড পরিষ্কার বুঝিয়ে দিচ্ছে বাড়িতে পঞ্চাশ হাজার টাকার ঘটনা চূড়ান্ত পরিণতির দিকে চলে গেছে। শুধু মা'র বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না। বাড়িতে ইন্টারেস্টিং কোনো ঘটনা ঘটবে আর তিনি থাকবেন না। তা হয় না। মুহিব কাজের মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল, এই মেয়ে তুমি আমাকে কড়া করে এক কাপ চা খাওয়াতে পারবে ? কাজের মেয়েটা ভোঁতা মুখ করে বলল, আমার হাত বন্ধ।

মুহিব নিজের ঘরে ঢুকে গেল। তার সারা শরীর কুটকুট করছে। শরীর থেকে বাসের কন্ডাকটরদের গায়ের গন্ধের মতো গন্ধ বের হচ্ছে। সারাদিন ঘোরাঘুরির উপর দিয়ে গিয়েছে। গায়ে ঘামের আস্তর পড়ে গেছে। সাবান ডলে ডলে ঘামের আস্তর একের পর এক সরাতে হবে। এটি একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় যাবার আগে গরম এক কাপ চা খেয়ে নিলে হতো। সেটা সম্ভব হচ্ছে না। মুহিব গায়ের ঘামে ভেজা শার্ট খুলতে গিয়েও খুলল না। বাথরুমে সাবান নেই এটা মনে ছিল না। সাবান কিনে আনতে হবে। সাবান কিনে ফেরার সময় খায়রুলের দোকান থেকে ইসপিশাল নতুন পাত্তির চা খেয়ে আসা যায়।

মুহিব কখন ফিরেছ ?

মুহিবের বড়ভাবি দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন। মুহিব বলল, তিন মিনিট এখনো পার হয় নি।

আজ দুপুরবেলা তোমার খোঁজে একটা মেয়ে এসেছিল। হাউমাউ করে কান্না।

মেয়েটা কে ?

আমরা তো কেউ চিনি না। নাম বলল যূথী।

যূথী নামে কাউকে চেন ?

একদিন দেখা হয়েছিল।

ঘটনাটা কী ? একদিন যার সঙ্গে দেখা সে এ রকম কাঁদবে কেন ?

তোমরা জিজ্ঞেস কর নি কেন কাঁদছে ?

আমি অনেকবারই জিজ্ঞেস করেছি। কিছুই বলে না, শুধু কাঁদে। একটা টেলিফোন নাম্বার দিয়ে গেছে। শুধু বলে গেছে তুমি যখনই আস, যত রাতেই আস এই টেলিফোন নাম্বারে টেলিফোন করার জন্যে। দেব টেলিফোন নাম্বার ?

দাও।

তোমাকে ভূতের মতো লাগছে কেন ? কোথায় ছিলে ?

ঘোরাঘুরির মধ্যে ছিলাম। ভাবি এক কাপ চা খাওয়াতে পারবে ?

কেন পারব না। চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

তোমার কাছে ফ্রেশ গায়েমাখা সাবান আছে ?

থাকার তো কথা। আমি চা এবং সাবান পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ভাবি থ্যাংক য়্যু। আমি আমার জীবনের দীর্ঘতম গোসলটা আজ সারব। The longest bath.

গোসল সেরে বড়চাচার সঙ্গে দেখা করো। উনি তোমাকে খুঁজছিলেন।

কোনো বিশেষ ঘটনা ?

জানি না তো!

মুহিব বড়চাচার সামনে বসে আছে। তিনি খবরের কাগজ পড়ছিলেন। হাতের ইশারায় মুহিবকে বসে থাকতে বলেছেন। সে বসেই আছে। আজকালকার খবরের কাগজে এত মন দিয়ে পড়ার কিছু থাকে না। তোফিকুর রহমান সাহেবের অনেক বিরক্তিকর অভ্যাসের মধ্যে এটি একটি। কথা বলার জন্যে ডেকে পাঠিয়ে সামনে বসিয়ে রাখবেন, অন্য কোনো অর্থহীন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। সেই কাজ দীর্ঘ হতেই থাকবে। কিছুতেই আর শেষ হবে না।

মুহিব।

জি।

তোমার বিষয়ে একটা অপ্রিয় সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি। বাধ্য হয়ে নিতে হয়েছে। শেকসপিয়রের কথায় বলি— I have to be cruel only to be kind.

কী সিদ্ধান্ত ?

তুমি এই বাড়িতে আর বাস করবে না। অন্য কোথাও থাকবে। হোটেলে, কিংবা কোনো বন্ধুর বাড়িতে কিংবা রেলস্টেশনে।

জি আচ্ছা।

জানতে চাচ্ছ না কেন ?

বুঝতে পারছি। মনে হচ্ছে চুরি সংক্রান্ত কিছু। বড় ভাইজানের টাকাটা বোধহয় আমার ঘরে পাওয়া গেছে।

তৌফিকুর রহমান ইজিচেয়ারে সোজা হয়ে বসতে বসতে বিস্মিত গলায় বললেন, আমি অবাক হচ্ছি, তুমি খুবই স্বাভাবিক আচরণ করছ। তোমার মধ্যে অপরাধবোধ গ্লানিবোধ কিছুই দেখছি না।

মুহিব বলল, একটু আগে গোসল করেছি তো চাচা! আমাকে ফ্রেশ লাগছে। চেহারায় এই জন্যেই গ্লানিবোধ অপরাধবোধ এইসব জিনিসের ছাপ পড়ছে না।

তোমার সঙ্গে আমার কথা শেষ, তুমি এখন যাও। যদি সম্ভব হয় তুমি তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা করবে। সেই বেচারি মনে খুব কষ্ট পেয়েছে। কান্নাকাটি করছিল। তোমার মুখ দেখতে হবে এই ভয়ে সে বাড়ি ছেড়েই চলে গেছে।

মুহিব উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, আপনি যে ছাগলের লাদির মতো বড়িগুলো খাওয়াচ্ছিলেন সেগুলি কি খেয়েই যাব না খাওয়া বন্ধ করে দেব ?

তৌফিকুর রহমান কোনো জবাব দিলেন না। মুখের সামনে খবরের কাগজ ধরলেন।

রাত দশটার দিকে মুহিব একটা স্যুটকেস এবং একটা হ্যান্ডব্যাগ নিয়ে খায়রুল মিয়ার ফ্ল্যাট বাড়িতে উঠে এলো। খায়রুল মিয়ার আনন্দের সীমা রইল না। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে সে কী করবে ভেবে উঠতে পারছে না।

সে তার হাঁসের মতো ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, ভাইজান এখন থেকে এই বাড়ি আপনার বাড়ি। বুঝেছেন, কী বলেছি ? আপনার বাড়ি। যদি মনে করেন আমাকে লাথি দিয়ে বের করে দিবেন— কোনো অসুবিধা নাই। আমার পাছায় লাথি দিবেন।

মুহিব বলল, ঠিক আছে প্রয়োজনে দেব।

রাতে খানা কী খাবেন, বলেন।

রাতে কিছু খাব না। শরীর ভালো লাগছে না। কাল সকালে আমি চাকরিতে জয়েন করব। আমার টাই দরকার। টাই জোগাড় করে দেবেন। পারবেন?

আমি পারব না, কী বলেন আপনি? আপনি বলেন কী! আপনার টাই কয়টা দরকার? কী কালার?

মুহিব জবাব দিল না। খায়রুল আগ্রহের সঙ্গে বলল, ভাইজান আপনি চাকরি পেয়েছেন? মুহিব জবাব দিল না।

খায়রুলের সকল প্রশ্নের জবাব দিতে তার ভালো লাগে না। কোনো এক বিচিত্র কারণে ক্লান্তিতে তার চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। তাকে প্রেসক্লাবের সামনে অবশ্যই যেতে হবে। হারুনের অবস্থাটা কী দেখে আসা দরকার।

মনোয়ারা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন। নিজের ছেলেকে তাঁর অচেনা লাগছে। ফিটফাট সাহেব। সাদা প্যান্টের উপর হালকা সবুজ রঙের ফুলহাতা শার্ট। গলায় টাই ঝুলছে। টাইটার রঙও সবুজ। সবুজের উপর সবুজ দেখতে এত ভালো লাগছে। টাইপরা অবস্থায় মুহিবকে তিনি আগে দেখেন নি। মনোয়ারা অবাক হয়ে বললেন, ব্যাপার কী রে?

মুহিব বলল, তোমাকে সালাম করতে এসেছি।

সালাম কী জন্যে?

চাকরিতে জয়েন করব। আজই জয়েন করার কথা।

মনোয়ারা অবিশ্বাসী গলায় বললেন, সত্যি চাকরি পেয়েছিস? বেতন কত?

মুহিব নিচু গলায় বলল, পনেরো-বিশ হাজার হবে। মাস শেষ হোক। বেতনটা হাতে পাই তারপর বোঝা যাবে।

আমার সঙ্গে ফাজলামি করছিস না তো?

না।

মুহিব নিচু হয়ে মা'র পা ছুঁয়ে সালাম করল।

মনোয়ারা সন্দেহ মিশ্রিত গলায় বড় মেয়েকে ডাকলেন, বুলু, শুনে যা। মুহিব বলছে সে চাকরি পেয়েছে। স্যুট-টাই পরে সাহেব সেজে এসেছে।

বুলু রান্নাঘরে রান্না করছিল। সেখান থেকে গলা উঁচিয়ে ডাকল, মুহিব, শুনে যা এদিকে।

মুহিব রান্নাঘরের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে উঁকি দিল। ভেতরে ঢুকল না। রান্নাঘর ধোঁয়ায় অন্ধকার। গরম এবং ধোঁয়ার মধ্যে ঢোকার কোনো অর্থ হয় না।

বুলু বলল, তুই চাকরি পেয়েছিস?

মুহিব বলল, হুঁ। জয়েন করতে যাচ্ছি, আজই জয়েনিং ডেট।

চাকরির কথা আগে কোনো দিন শুনলাম না। আজ একেবারে জয়েনিং ডেট। এগুলি কেন করছিস, মাকে খুশি করার জন্য? যাতে মা মনে করে আমার

ছেলে চোর না। চাকরি-বাকরি করে। অফিসার সেজে অফিসে যায়। এতদিন শুনেছি— চোরের মা'র বড় গলা। এখন দেখি চোরের তার চেয়েও বড় গলা।

মুহিব বলল, চুরির ব্যাপারটা শুনেছ ?

বুলু বলল, কেন শুনব না ? তুই কি ভেবেছিলি চুরির ব্যাপার নিয়ে কেউ আলোচনা করবে না ? আমি তো চিন্তাই করতে পারি নি কেউ তার ভাইয়ের টাকা চুরি করতে পারে।

অন্যের টাকা চুরি করার চেয়ে ভাইয়ের টাকা চুরি করা ভালো না ? টাকা সংসারেই থাকল। বাইরে গেল না।

বুলু রাগী গলায় বলল, চুরির পক্ষে যুক্তি দেয়াও শুরু করেছিস ? লজ্জাও করছে না ? লায়েক তো ভালোই হয়েছিস। আমাকে এখন যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, আপনার ভাইরা কী করে ? আমি কী বলব ? এক ভাই ব্যাংকের এজিএম, আরেক ভাই প্রফেসর, সবচেয়ে ছোটটা চোর। শ্বশুরবাড়িতে আমার মুখ বলে কিছু আছে ? নিজের বাবা সম্পর্কেও কাউকে কিছু বলতে পারি না। ঘেন্না লাগে। ঐ দিন দেখি বাসার সামনে হাঁটাহাঁটি করছে। সঙ্গে সঙ্গে জানালা বন্ধ করে দিয়েছি।

বাবা তোমার বাসার সামনে হাঁটাহাঁটি করে ?

মাসে এক দুইবার করে। লজ্জাহীন মানুষ হলে যা হয়।

মুহিব বলল, আপা যাই।

বুলু বলল, চা-টা কিছু খাবি ? নাশতা করে এসেছিস ?

মুহিব বলল, চা খাব না। নাশতাও করে এসেছি।

এখন যাচ্ছিস কোথায় ঠিক করে বল তো ?

মুহিব জবাব দিল না।

বুলু বলল, তোকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে— এটা কি সত্যি ? নিজের ভাই বাড়ি থেকে বের করে দেয়— কী লজ্জার কথা! না-কি তোর লজ্জা লাগছে না ?

মুহিব বলল, আমিও খানিকটা বাবার মতো লজ্জাহীন। আপা, আমি যাচ্ছি।

মুহিবের ঘড়িতে বাজছে সাড়ে সাতটা। হাতে অনেক সময় আছে। মতিঝিল পৌঁছতে আধ ঘণ্টার মতো লাগবে। প্রেসক্লাবের সামনে কিছুক্ষণের জন্যে থামলে কেমন হয় ? মুহিব এই চিন্তাকে প্রশ্রয় দিল না।

একবার নামলে আটকা পড়ে যেতে হবে। অফিস থেকে সরাসরি প্রেসক্লাবের সামনে ফিরলেই হবে। তারচে' বরং বাবার সঙ্গে দেখা করে আসা

যায়। মা'কে সালাম করা হয়েছে। বাবাকে সালাম করা হয় নি। বন্ধুত্বের উপর কবি ইয়েটস-এর দু' লাইন কবিতা লিখিয়ে নিয়ে আসতে হবে। জটিল কবিতা, দু'লাইন শুনলে মুখস্থ হবে— এমন স্মৃতিশক্তি তার নেই।

প্রেসক্লাবের সামনে যাবে না যাবে না ভেবেও মুহিব সেখানেই আগে গেল। শুধু বাবাকে না, সফিককেও সালাম করতে ইচ্ছা করছে।

প্রেসক্লাবের সামনে সফিক একা বসে আছে। হারুন যে সতরঞ্জির উপর বসে ছিল সেটা খালি। তবে পোস্টারে পোস্টারে চারদিক ছয়লাপ। ছোট একটা তাঁবুও খাটানো হয়েছে। প্লাস্টিকের চেয়ারগুলি এখন তাঁবুর ভিতর। সফিক অসম্ভব বিরক্ত। গত দু'দিনে শেভ করে নি বলে খোঁচা খোঁচা দাড়ি বের হয়ে তাকে দেখাচ্ছে পুরোপুরি জংলির মতো।

সফিক মুহিবের দিকে তাকিয়ে রাগী গলায় বলল, তোর ঘটনা কী ? এখানে কত সিরিয়াস ব্যাপার, আর তুই ডুব মারলি ? রাতে একবার আসবি না ? দোকানদার একটাকে পাঠিয়ে দিয়েছিস— খায়রুল না বায়রুল কী যেন নাম— গলা দিয়ে শব্দ বের হচ্ছে না, তারপরেও সারাক্ষণ কথা। সে তো এসেই হারুনকে মিরপুরে তার কোন শাড়ির দোকানে চাকরি দিয়ে দিল। এইসব বেকুব তুই কোত্থেকে জোগাড় করিস ?

মুহিব কিছু বলল না।

তুই না-কি ঐ বেকুবের বাড়িতে গিয়ে উঠেছিস ? কেন ? বাড়ি থেকে লাথি দিয়ে বের করে দিয়েছে ?

ব্যাপারটা সে-রকমই।

ভালোই হয়েছে, রাতে আড্ডা দেবার একটা জায়গা হয়েছে।

সফিক সিগারেট ধরাল। তার মেজাজ ঠাণ্ডা হয়ে আসছে এটা বোঝা যাচ্ছে। সে নরম গলায় বলল, তোর কি আজ চাকরিতে জয়েনিং ? সাজসজ্জা সে-রকমই মনে হচ্ছে।

মুহিব বলল, জি।

চাকরিতে জয়েনিং, তাহলে এখানে এসেছিস কেন ? প্রথম দিনেই অফিসে দেরি করে যাবি ? আমাদের কথা এখন একেবারেই মাথায় রাখবি না। মন দিয়ে চাকরি করবি।

মুহিব এগিয়ে এসে সফিকের পা ছুঁয়ে সালাম করল। সফিক বিরক্ত গলায় বলল, এইসব কী ? নিজের বাবা মা'কে সালাম করেছিস ?

মা'কে করেছি।

একটা বেবিটেক্সি নিয়ে এক্ষুণি তোর বাবার কাছে যা। তাঁকে সালাম কর। আমি একটা থার্ড গ্রেড ড্রাগ এডিক্ট, মাতাল। আমাকে তুই সালাম করছিস কী মনে করে? তোর কি ব্রেইন ডিফেক্ট হয়ে গেছে? হা করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? বেবিটেক্সি নিয়ে বাবার কাছে চলে যা। বেবিটেক্সি ভাড়া আছে?

আছে।

সত্যি আছে তো?

জি আছে। সফিক ভাই, হারুন কোথায়?

আরে ঐ গাধার কথা বলিস না। সে বাথরুম করতে নিজের বাড়িতে গেছে। তার না-কি অপরিচিত জায়গায় বাথরুম হয় না। এইসব ইডিয়টদের নিয়ে আমার চলতে হয়। আত্মাহুতি যে দেবে সে আরাম করে হাগু করার জন্যে বাসায় চলে গেছে। আমি একা দোকান খুলে বসে আছি। একটার পর একটা যন্ত্রণা পার করছি। অসহ্য লাগছে। কেরোসিনের টিন কিনেছিলাম— হাপিশ।

হাপিশ মানে?

দশ মিনিটের জন্যে সিগারেট কিনতে গিয়েছি। টিনটা তাঁবুর ভিতর রেখে গেছি, ফিরে এসে দেখি নাই। আবার একটা কেরোসিনের টিন কিনতে হবে। কেরোসিনের টিন বড় একটা পাবলিসিটি। সবাই হারুনকে যতক্ষণ দেখে তার চেয়ে বেশি দেখে কেরোসিনের টিনটাকে। হারুনের যে ক'টা ছবি পত্রিকায় ছাপা হয়েছে সবক'টা ছবির বেস-এ কেরোসিনের টিনটা আছে।

লোকজন কেমন আসছে?

ভালোই আসছে। Response খুবই ভালো। ফিল্ম লাইন থেকে নায়ক রিয়াজ এসেছিলেন। চারদিকে ভিড় হয়ে গেল। হারুনের সঙ্গে পাঁচ মিনিটের মতো বসেছিলেন। এত বড় স্টার, কিন্তু কোনো অহঙ্কার দেখলাম না। আমাকে বললেন, দেখি ভাই একটা সিগারেট দিন তো। আরে এমনই আমার কপাল, সিগারেট দিতে পারলাম না।

কেন?

প্যাকেটটা খুলে দেখি প্যাকেট খালি। লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেছে। রিয়াজ সাহেব নিজেই অ্যাসিসটেন্ট পাঠিয়ে সিগারেট আনালেন। নিজে একটা খেলেন। সবাইকে দিলেন। যাবার সময় প্যাকেটটা আমার হাতে দিয়ে গেলেন। নিখুঁত ভদ্রলোক। তুই দেখি হা করে গল্পই শুনছিস। বিদেয় হ। ভালো কথা। যূথী নামের মেয়েটার সঙ্গে কি তোর যোগাযোগ হয়েছে?

না।

ঐ মেয়ে প্রেসক্লাবের সামনে গতকাল তিনবার এসেছে। তোর সঙ্গে কথা বলতে চায়। খুব নাকি জরুরি। আমি বলে দিয়েছি মুহিব রাজশাহী গেছে তার এক ভাগ্নির বিয়েতে। চার পাঁচ দিন পরে ফিরবে। এই বলে কাটান দিয়েছি। যাই হোক, যূথীর ব্যাপার নিয়ে তোকে চিন্তা করতে হবে না। তুই তোর কাজ কর। এখন মাথার ভেতর যূথী-ফূথী ঢোকালে সমস্যা আছে।

শামসুদ্দিন সাহেবের বাড়ির সব দরজা-জানালা খোলা। বাড়ির উঠানে টুল পাতা। টুলে মাথা কামানো গুণ্ডা টাইপ চেহারার এক লোক বসে আছে। মুহিবের দিকে তাকিয়ে সেই লোক বলল, কারে চান?

মুহিব বলল, এই বাড়িতে যিনি থাকতেন তাকে চাচ্ছি।

আপনি তার কে হন— কুটুম্ব?

আমি উনার ছেলে।

যান, ভিতরে যান।

আপনি কে?

আমি কে তা দিয়া আপনার প্রয়োজন নাই। যারে প্রয়োজন তার কাছে যান।

মুহিব ঘরে ঢুকে দেখল তার বাবা তোষক বিহীন বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসে আছেন। ঘরের সব জিনিসপত্র বাঁধাছাদা করা হয়েছে। শামসুদ্দিন সাহেব ছেলেকে দেখে অবাকও হলেন না, খুশিও হলেন না। অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে রইলেন। মুহিব বলল, ঘটনা কী বাবা? এই বাড়ি ছেড়ে দিচ্ছ?

শামসুদ্দিন সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন, হুঁ। কয়টা বাজে দেখ তো!

আটটা চল্লিশ।

দশটার ভেতর ছেড়ে দিতে হবে। না হলে অসুবিধা আছে।

কী অসুবিধা?

শামসুদ্দিন জবাব দিলেন না। মুহিব বলল, বাবা তোমার কি শরীর খারাপ?

সামান্য জ্বর আছে।

মুহিব গায়ে হাত দিয়ে চমকে উঠে বলল, সামান্য কোথায়? জ্বর তো অনেক। এই জ্বর নিয়ে যাবে কোথায়? কিছু ঠিক করেছ?

না। আপাতত কোনো হোটেলে উঠব।

কোন হোটেলে?

কিছু ঠিক করি নাই। তুই দুশ্চিন্তা করিস না।

বাবা, তোমার অবস্থা দেখে আমার খুবই খারাপ লাগছে। তোমার শরীর অসম্ভব খারাপ। আমি কী বলছি না বলছি তাও মনে হয় তুমি বুঝতে পারছ না।

শামসুদ্দিন ক্লান্ত গলায় বললেন, বুঝতে পারছি।

মুহিব বলল, বাবা, আমি একটা চাকরি পেয়েছি। ভালো বেতনের ভালো চাকরি। আমি এসেছি তোমাকে সালাম করতে। তুমি আজকের দিনটা এ বাড়িতে থাক। আমি সন্ধ্যার আগে আগেই তোমাকে নিয়ে যাব।

কোথায় নিয়ে যাবি ?

সেটা তখন ঠিক করব। আজ দিনটা এ বাড়িতে তোমাকে থাকতে দেবে না ?

দিবে।

বাবা, তুমি খুব মন দিয়ে শোন, আমি কী বলছি। তুমি অনেক কষ্ট করেছ, তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না। তুমি আমার সঙ্গে থাকবে।

তোর বৌ তো রাগ করবে রে ব্যাটা।

বাবা, তোমার মাথা তো মনে হয় এলোমেলো হয়ে গেছে। আমি এখনো বিয়ে করি নি।

এক সময় তো করবি।

যখন করব তখন দেখা যাবে। বাবা, আমি তোষক বিছিয়ে দিচ্ছি। তুমি চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে থাক। আমি অফিস শেষ করে তোমাকে এসে নিয়ে যাব।

আচ্ছা। তুই আমার জ্বর নিয়ে চিন্তা করিস না। আমার জ্বর বেশিক্ষণ থাকে না।

আশেপাশে কোনো ডাক্তার বসেন ? তাহলে আমি তাঁকে বলে যেতে পারি তোমাকে এসে দেখে যাবেন।

নিউ হোমিও হলের ডাক্তার সাহেব আছেন। আমার বন্ধু মানুষ। উনাকে বলে গেলেই হবে।

আমি তাঁকে বলে যাচ্ছি।

শামসুদ্দিন সাহেব ছেলের পিঠে হাত রেখে বললেন, তুই এত দুশ্চিন্তা করছিস কেন ? আমার জ্বর কমে যাচ্ছে।

নিউ হোমিও হল বন্ধ। দশটার আগে খুলবে না। মুহিব ঘড়ি দেখল।

নয়টা দশ বাজে। আর সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। অফিসের সময় হয়ে গেছে। জয়েনিং এর দিনে এক ঘণ্টা দেরি করে উপস্থিত হলে খবর আছে। মুহিব একটা বেবিটেক্সি ভাড়া করল। বেবিটেক্সিতে উঠার পর পরই তার মনে হলো

অফিসে পৌঁছানোর পর সে দেখবে চিচিং ফাঁক। চাকরি নেই। বস শ্রেণীর কেউ গম্ভীর গলায় বলবেন, সরি, কোম্পানির আর্থিক অবস্থা ভালো না এই জন্যে নতুন রিক্রুটিং আপাতত বন্ধ। মাস ছয়েক পর খোঁজ নেবেন। বুঝতেই পারছেন World wide রিসিশান যাচ্ছে। প্রচুর লে অফ হচ্ছে। বলুন কী খাবেন? চা— না কফি।

সে চা খেতে চাইবে। যে বেয়ারা চা নিয়ে আসবে সে সিরিয়াস ধরনের মুখের ভঙ্গি করে রাখবে। তাচ্ছিল্যের হাসি ঠোঁটের কোণায় থাকবে। তবে তা ঠিক ধরা যাবে না। চা শেষ করে অফিস থেকে বের হবার সময় সবাই বিশেষ চোখে একবার করে হলেও তার দিকে তাকাবে। কেউ হয়তো বা বলবে— টাই লাগিয়ে মাঞ্জা দিয়ে চলে এসেছে। মাঞ্জায় কাজ হবে না রে বাবা।

জয়েন করতে মুহিবের কোনো সমস্যা হলো না। শিকদার নামের এক ভদ্রলোক তার দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, ওয়েলকাম। থ্যাংকয়্যুর উত্তরে ওয়েলকাম বলতে হয়। ওয়েলকামের উত্তরে কী বলতে হয়? বোকার মতো হাসা কি ঠিক হচ্ছে? মুহিব পরিষ্কার বুঝতে পারছে— তার ঠোঁটের কোণায় বোকা বোকা টাইপ একধরনের হাসি ঝুলে আছে।

ঘরের মেঝে অতিরিক্ত মসৃণ। মুহিবের কেবলই মনে হচ্ছে যে-কোনো মুহূর্তে সে পা পিছলে উল্টে পড়ে যাবে। অফিসের সবার জন্যে দৃশ্যটা অবশ্যই মজার হবে। একেকজন একেক রকম শব্দ করে হাসবে। হাঁটাহাঁটি না করে কোনো একটা ঘরে চুপচাপ বসে থাকতে পারলে হতো। আচ্ছা এরা কি তাকে আলাদা কোনো ঘর দেবে? মনে হয় না। চাকরির পোস্টটা কী তা এখনো জানা হলো না। সে কি শিকদার সাহেবকে জিজ্ঞেস করবে? আগ বাড়িয়ে এত উৎসাহ দেখানো কি ঠিক হবে? একজন কেউ যদি থাকত যে বলে দেবে কী ঠিক হবে কী ঠিক হবে না।

মুহিব তার নিজের ঠাণ্ডা ঘরে বসে আছে। কোনো অফিসের উপরের দিকের অফিসারদের ঘরের মতো ঘর। পিসি, টেলিফোন, ইন্টারকম, রিভলভিং চেয়ার সবই আছে। মুহিব জবুথবু হয়ে বিভলভিং চেয়ারে বসে আছে। তার সামনে শিকদার সাহেব। ভদ্রলোক হাস্যমুখী। মুখে সারাক্ষণ হাসি। শব্দহীন হাসি। মুহিব কোথায় যেন পড়েছিল— 'যে পুরুষ নিঃশব্দে হাসে তাহার বিষয়ে সাবধান।'

মুহিব সাহেব!

জি।

এই আপনার ঘর। ঘরের ইন্টেরিয়র যদি চেঞ্জ করতে চান, করবেন। পছন্দের কোনো পেইনটিং লাগাতে চাইলে লাগাতে পারেন।

জি আচ্ছা।

আজ আপনার কোনো কাজ নেই। নিজেকে ধাতস্ত করুন। সবার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করুন। টেলিফোনে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে কথা বলুন। রিলাক্স করুন।

জি আচ্ছা।

আমার কাছে কিছু জানতে চাইলে জিজ্ঞেস করতে পারেন।

মুহিব বলল, আমার কাজটা কী ?

শিকদার সাহেব বললেন, আপনার কাজ হলো চেয়ারে বসে থাকা। হা হা হা।

ভদ্রলোক এই প্রথম শব্দ করে হাসছেন। কাজেই শব্দ করে হাসার ব্যাপারটা ভদ্রলোক যে জানেন না তা-না। যারা মাঝে মাঝে শব্দ করে হাসে তাদের বিষয়ে নিশ্চয়ই সাবধান হবার কিছু নেই।

আপনার পোস্টটা যে কী তা আমি নিজেও ঠিক জানি না। আমাদের অফিসের শাখা চিটাগাং-এ আছে, খুলনায় আছে। আমি উড়াউড়া যা শুনেছি তাতে মনে হচ্ছে আপনাকে খুলনা অফিসে দিয়ে দেয়া হবে। ঢাকা ছেড়ে বাইরে যেতে অসুবিধা নেই তো ?

জি-না।

বড় সাহেব এখনো অফিসে আসেন নি। তিনি সাধারণত লাঞ্চ করে আসেন। বড় সাহেব এলে তার সঙ্গে দেখা করবেন। আপনার পোস্ট কী, দায়িত্ব কী তিনি বুঝিয়ে বলবেন। আমি এখন বিদায় নিচ্ছি। লাঞ্চের সময় আপনাকে ডেকে নিয়ে যাব। ঠিক আছে ?

ঠিক আছে।

আপনাকে টেনসড মনে হচ্ছে। টেনসড হবার মতো কোনো ঘটনা ঘটে নি। রিলাক্স করুন। ইন্টারকমে নাম্বার থার্টি টু'তে ক্যান্টিন পাবেন। চা-কফি কিছু খেতে চাইলে ওদের বললেই হবে।

জি আচ্ছা।

আপনাকে যে পিওন দেয়া হয়েছে সে পুরনো লোক। অফিস সম্পর্কে যে-কোনো তথ্য আপনি তার কাছে পাবেন। হ্যাভ ফান।

মুহিব কোনো ফান পাচ্ছে না। তার হাঁসফাঁস লাগছে। গলায় টাই এঁটে বসেছে। কোনো কারণে কি গলা ফুলে গেছে ? সকালে টাইটা ফাঁসের মতো

লাগে নি। এখন লাগছে। এসি মনে হয় অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় দেয়া আছে। শীতে শরীর জমে যাচ্ছে। বেল টিপে বেয়ারাকে ডেকে এসি কমাতে বলবে ? বেয়ারা নিয়ে একটা বড় সমস্যা হয়েছে। বেয়ারার নাম শামসুদ্দিন। তার বাবার নামে নাম। মুহিব নিশ্চয়ই বলতে পারে না— থুক্কু শামসুদ্দিন নামের কোনো বেয়ারা থাকলে আমি খেলব না। আমাকে অন্য নামের বেয়ারা দিতে হবে।

মুহিব বেল টিপল। কিছুক্ষণ কথা বলা যাক শামসুদ্দিনের সঙ্গে।

স্যার, ডেকেছেন ?

জবাব না দিয়ে মুহিব তাকিয়ে আছে। লোকটার নামই যে তার বাবার মতো তা না। চেহারার মধ্যেও খানিকটা মিল। লম্বা ফর্সা। দাঁড়িয়েও আছে খানিকটা কুঁজো হয়ে।

ঠাণ্ডা পানি খাওয়াতে পারবে ?

অবশ্যই পারব স্যার।

এসিটা একটু কমিয়ে দাও, ঘর বেশি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আর শোন, তোমার ডাক নাম কী ?

স্যার আমার একটাই নাম। শামসুদ্দিন।

সমস্যা কী হয়েছে জানো ? আমার বাবার নাম শামসুদ্দিন। কাজেই শামসুদ্দিন শামসুদ্দিন বলে তোমাকে ডাকা আমার জন্যে কঠিন হয়ে পড়বে।

স্যার, আমাকে দুলাল ডাকবেন ?

দুলাল কি তোমার ডাক নাম ?

জি-না। আমার ডাক নাম শামছু।

তাহলে দুলাল ডাকব কেন ? দুলাল কে ? আচ্ছা থাক, কে জানার দরকার নেই। তোমাকে আমি দুলাল ডাকব না। আমি চেষ্টা করব নাম না ডেকে পার করা যায় কি-না।

শামসুদ্দিন এসির ঠাণ্ডা কমিয়ে দিল। জগভর্তি ঠাণ্ডা পানি নিয়ে এলো।

স্যার, আর কিছু লাগবে ?

না, আর কিছু লাগবে না।

খবরের কাগজ এনে দেব স্যার পড়বেন ?

আমি খবরের কাগজ পড়ি না।

মুহিব টেলিফোন সেটটা কাছে টানল।

একটা টেলিফোন নাম্বারই সে জানে। নোরার নাম্বার। চাকরিতে জয়েন করার ব্যাপারটা নোরাকে জানানো দরকার।

হ্যালো নোরা ?

নোরা যথানিয়মে বলল, আপনি কে বলছেন জানতে পারি কি ?

মুহিব।

নোরা ঝলমলে গলায় বলল, ও আচ্ছা তুমি। খুব ভালো সময়ে টেলিফোন করেছ। আমি মনে মনে তোমাকে খুঁজছিলাম।

মুহিব বলল, কেন বলো তো ?

নোরা বলল, কোনো কারণ নেই, এমনি। হোমোসেপিয়ানসরা প্রাণী হিসেবে খুবই লজিক্যাল, তারপরেও তারা বেশিরভাগ কাজ করে কোনো কারণ ছাড়া।

তোমাকে একটা ভালো খবর দেয়ার জন্যে টেলিফোন করেছি।

খবরটা দিও না। আমাকে আন্দাজ করতে দাও। তুমি চাকরি পেয়েছ ? হয়েছে ?

হ্যাঁ হয়েছে। দশে দশ পেয়েছ। আজ আমি চাকরিতে জয়েন করেছি।

একসেলেন্ট! কনগ্রাচুলেশনস। এক কাজ কর, আজ সন্ধ্যার পর বাসায় চলে এসো। কী চাকরি কী ব্যাপার শুনব।

আচ্ছা।

হিপনোসিসের ব্যাপারটাও তোমার উপর চেষ্টা করে দেখব। আমি নিশ্চিত যে হবে।

হলে তো ভালোই।

মুহিব শোন, আমি তোমার বন্ধু হারুনকে দেখতে গিয়েছিলাম। যে আগুনে পুড়ে মরে যাবে বলে ঘোষণা দিয়েছে।

কী দেখলে ?

আমি আমার জীবনে এমন হাস্যকর ঘটনা দেখি নি। হারুন নামের মানুষটা বন্ধু-বান্ধব নিয়ে বসে আছে। উৎসব উৎসব ভাব। দলের একজন লিডার আছে, তার নাম সফিক। সে এসে আমাকে বলল, ম্যাডাম, আমরা একটা গণসঙ্গীতের আয়োজন করেছি। সেখানে আপনি যদি আপনার 'উড়ালপঙ্খি' গানটা গেয়ে দেন খুব ভালো হয়।

তোমার কাছে হাস্যকর মনে হচ্ছে ?

অবশ্যই হাস্যকর। সত্যি করে বলো তো, তোমার বন্ধু কি আসলেই গায়ে আগুন দেবে ?

মুহিব জবাব দিল না। নোরা বলল, তোমার বন্ধুকে মাথা থেকে উদ্ভট চিন্তা দূর করতে বলো। সে চাইলে সিলেটের চা-বাগানে আমি তার জন্যে চাকরির ব্যবস্থা করতে পারি।

মুহিব আগ্রহের সঙ্গে বলল, চা-বাগানে তোমার চেনাজানা আছে ?

নোরা বলল, আমাদের একটা ছোটখাট চা-বাগান আছে।

বলো কী ?

তোমার বন্ধুকে আমার প্রপোজাল দিয়ে দেখ।

মনে হয় না সে রাজি হবে। কারণ সে তো তার নিজের চাকরির জন্যে আত্মাহুতি দিচ্ছে না। সে কাজটা করছে For a cause.

তোমার ধারণা সে টিভি ক্যামেরার সামনে গায়ে আগুন দেবে ? লাইভ টেলিকাস্ট হবে ?

মুহিব জবাব দিল না। নোরা বলল, কথার জবাব দিচ্ছ না কেন ?

ভাবছি।

কী ভাবছ ?

সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা ব্যাপার নিয়ে ভাবছি। আমার মনে হঠাৎ একটা সন্দেহ দেখা দিয়েছে। নোরা শোন, আমি এই যে চাকরিটা পেয়েছি তার পেছনে তোমার কি কোনো হাত আছে ?

নোরা শান্ত গলায় বলল, এই প্রশ্ন আসছে কেন ? এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার পেছনে কারণ কী ?

কোনো কারণ নেই। তুমি তো বলেছ হোমোসেপিয়ানসরা বেশির ভাগ কাজই করে কোনো কারণ ছাড়া। আচ্ছা নোরা, দ্য এরনস কোম্পানিটা কি তোমাদের ?

নোরা শান্ত গলায় বলল, আমার বাবা এই কোম্পানির মেজর শেয়ার হোল্ডার। আমি চারজন ডিরেক্টরের একজন।

তার মানে চাকরিটা পাওয়ার পেছনে তোমার অবদান আছে ?

যদি থাকে তাতে কোনো সমস্যা আছে ?

না কোনো সমস্যা নেই।

মুহিব শোন, তোমার চাকরি পাওয়ার পেছনে আমার সামান্য ভূমিকার কারণে যদি তোমার ভেতর কোনো গ্লানিবোধ তৈরি হয় সেটা আমি দূর করে দেব। খুব সহজেই দূর করে দেব।

কীভাবে ? হিপনোসিসের মাধ্যমে ? হিপনোটিক সাজেশান ?

হ্যাঁ।

তাহলে তো ভালোই হয়। শুধু গ্লানিবোধ কেন ? আমার মনে আরো অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত বোধ আছে। সব দূর করে দাও।

টেলিফোন রেখে মুহিব তার গলার টাই সামান্য আলগা করে দিল। গলায় ফাঁসের মতো লাগছিল, এখন আরাম লাগছে। খানিকটা ঘুম ঘুমও পাচ্ছে। সোফাজাতীয় কিছু থাকলে লম্বা হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়া যেত।

দুপুরে শিকদার সাহেব মুহিবকে নিয়ে অফিসের ক্যান্টিনে লাঞ্চ খেতে গেলেন। বিদেশী কায়দার লাঞ্চ। একটা স্যান্ডউইচ, একটা আপেল, এক বাটি স্যুপ। টক-ঝাল স্যুপটা খেতে অসাধারণ।

শিকদার সাহেব বললেন, চাকরি কেমন লাগছে ?

মুহিব বলল, ভালো লাগছে।

শিকদার সাহেব বললেন, এই কোম্পানির চাকরি মোটামুটি আরামের, কাজের চাপ কম। তবে শুনতে পাচ্ছি বিদেশী কোনো এক কোম্পানির সঙ্গে নাকি যুক্ত হবে। তখন কী হবে কে জানে।

মুহিব বলল, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি বুদ্ধিমান মানুষ। ফাঁকি দিতে চাইলে একটা না একটা বুদ্ধি আপনি নিশ্চয়ই বের করতে পারবেন।

শিকদার সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, আপনি কী বুঝাতে চাচ্ছেন ধরতে পারছি না।

মুহিব বলল, আমি কিছু বুঝাতে চাচ্ছি না। রসিকতা করছি। আপনাদের অফিসে রসিকতা করা যায় তো ?

আপনাদের অফিস বলছেন কেন ? অফিসটা তো আপনারও।

মুহিব বলল, না। আমার অফিস না। আমি আপনাদের বড় সাহেবের জন্যে অপেক্ষা করছি। উনি এলেই রেজিগনেশন লেটার উনার হাতে ধরিয়ে পগারপার হয়ে যাব।

রেজিগনেশন লেটার দেবেন কেন ? কারণটা কী ?

মুহিব হাসিমুখে বলল, হোমোসেপিয়ানসরা খুবই বিচিত্র প্রাণী। তারা বেশির ভাগ কাজ করে কোনো কারণ ছাড়া। এটা আমার কথা না। আপনাদের অফিসের চারজন ডিরেক্টর-এর একজনের কথা।

আপনি কি সত্যি চাকরি করবেন না ?

না।

শিকদার সাহেব এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। মুহিবের কথাগুলো তিনি ঠিক বিশ্বাস করতে পারছেন না। আবার অবিশ্বাসও করতে পারছেন না। মুহিব বলল, আমি আরেকটা স্যুপ খাব।

দি আল মদিনা রেস্টুরেন্টের মালিক গত দু'দিন ধরে উত্তেজনাময় সময় কাটাচ্ছে। সে সার্বক্ষণিকভাবে সফিকদের সঙ্গে আছে। দৌড়াদৌড়ি ছোটাছুটি করছে। তার খুবই ভালো লাগছে। সবাই তার নাম দিয়েছে 'হংস বাবু'। এতেও সে খুব মজা পাচ্ছে। হংস বাবু ডাকলেও সবাই যে তার মতামতকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছে এতেই সে আনন্দিত। লেখাপড়া জানা শিক্ষিত সব ছেলে। এমএ, বিএ পাস। তার মতো মূর্খ হোটেল মালিকের সঙ্গে এদের কথা বলারই কথা না। অথচ কী আশ্চর্য কথা! গুরুত্বপূর্ণ যে-কোনো সিদ্ধান্তের সময় তার মতামত জানতে চাওয়া হচ্ছে।

টেলিভিশনওয়ালারা ছবি তুলতে এসেছিল। সেখানে তারা অনেকের সঙ্গে তাকেও প্রশ্ন করেছে। সে ঠিকঠাক মতো জবাব দিয়েছে। সফিক ভাই বলেছেন জবাব ভালো হয়েছে। টেলিভিশনওয়ালারা জিজ্ঞেস করেছে— আপনার নাম কী?

খায়রুল বলেছে, জনাব, আমার নাম খায়রুল। আমি আল মদিনা হোটেলের মালিক।

এদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কী?

খায়রুল ফ্যাসফ্যাসে গলায় কিন্তু স্পষ্ট করেই জবাব দিয়েছে। সে বলেছে, জনাব, আমি প্রথমে মজা দেখতে আসছিলাম। পরে দেখলাম বড়ই জটিল ঘটনা। আর যাইতে পারলাম না।

জটিল ঘটনা বলছেন কেন?

একটা শিক্ষিত জোয়ান ছেলে গায়ে আগুন লাগায়ে মরে যাবে। জটিল ঘটনা না?

আজ এক তারিখ। ঘোষণা অনুযায়ী আগামীকাল রাত বারটা এক মিনিটে হারুনের গায়ে আগুন লাগাবার কথা। সময় দ্রুত এগিয়ে আসছে। সফিক মোটামুটি নিশ্চিত ছিল— আজ দিনের মধ্যেই সরকার পক্ষের কেউ না কেউ আসবে। সরকার বেকার সমস্যার সমাধানের জন্যে যে-সব গুরুত্বপূর্ণ এবং

যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা জ্বালাময়ী ভাষায় বলবে। গায়ে আগুন দেয়াটা ধামাচাপা দেয়া যাবে। এখন পর্যন্ত সে-রকম কিছু ঘটে নি। যুব মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী বলেছিলেন আজ সকালে আসবেন। এখন জানা গেছে তিনি তার এলাকায় গেছেন। দু'দিন থাকবেন।

বিরোধী দলের কেউ এগিয়ে এলেও হতো। তাদের জন্যে এটা ভালো সুযোগ। এই ইস্যুতে তারা সরকারকে ধুয়ে ফেলতে পারবে। এমন একটা মারাত্মক ইস্যু কিন্তু বিরোধী দলের কোনো আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না। শেষ ভরসা কবি-সাহিত্যিকদের কেউ।

মহসিন গিয়েছিল কবি শামসুর রাহমান সাহেবের কাছে। হাতে-পায়ে ধরে তাঁকে যদি রাজি করানো যায়। তিনি আসবেন, আবেগময় ভাষায় কিছু কথা বলবেন। তারপর হারুনকে উঠিয়ে নিয়ে চলে যাবেন। মহসিন ফিরে এসেছে। কবি খুবই অসুস্থ। আসতে পারবেন না।

বিকেল থেকেই লোক জমতে শুরু করেছে। এমন জনসমাগমে খুশি হওয়া উচিত। সফিক খুশি হতে পারছে না। তার কাছে মনে হচ্ছে লক্ষণ ভালো না। আজই এত লোক, আগামীকাল না জানি কত হবে। পাবলিক মজা দেখার জন্যে আসবে। তাদেরকে ঠিকমতো মজা দিতে না পারলে সমস্যা আছে।

ষণ্ডাগুণ্ডা ধরনের এক লোক এসে হারুনকে বলেছে, আগুন কি সত্যই দিবেন ? ভাওতাবাজি না তো ? ফুটবেন না তো ?

লোকটার কথার ধরনে কলিজা শুকিয়ে যাবার কথা। হারুন অবশ্যি শান্ত গলায় বলেছে, আগামীকাল রাত বারটা এক মিনিটে অবশ্যই আগুন দেয়া হবে। ক্যামেরা আছে ? না থাকলে মনে করে ক্যামেরা নিয়ে আসবেন, ছবি তুলে রাখবেন।

চা-ওয়ালা, বাদামওয়ালা, ফুচকাওয়ালারা চলে এসেছে। লোকজন ফুচকা খাচ্ছে। সবার চোখ-মুখ দেখে মনে হচ্ছে তারা মজার কোনো ঘটনার জন্যে অপেক্ষা করছে। বিদেশী দুই সাহেবও এসেছেন। তারা ছোট ভিডিও ক্যামেরায় প্রচুর ছবি তুলেছেন। ছবি তোলার পর তারা চলে গেলেন না। খুবই মজা করে ফুচকা খাচ্ছেন।

খায়রুল সফিককে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলল— সফিক ভাই, অবস্থা তো খুব খারাপ।

সফিক বলল, খারাপ বলছেন কেন ?

আগামীকালের কথা চিন্তা করে কলিজায় পানি চলে এসেছে। মানুষ এখন পিশাচ হয়ে গেছে। গায়ে আগুন না দেখে এরা যাবে না।

সফিক চিন্তিত গলায় বলল, সে-রকমই তো মনে হচ্ছে।

খায়রুল বলল, প্রয়োজনে এরা নিজেরা হারুন ভাইয়ের গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন দিয়ে দিবে।

সফিক বলল, পালায়ে যাওয়া যায় না ?

খায়রুল চিন্তিত গলায় বলল, পালাইতে গেলে শক্ত মাইর খাওয়ার সম্ভাবনা।

সফিক বলল, কথা ভুল বলেন নাই। সব সাইকোলজি বোঝা মুশকিল। দেখা যাবে আমাদের সবার গায়েই কেরোসিন ঢেলে আগুন দিয়ে দিয়েছে। সবাই এক সঙ্গে কয়লা হয়ে গেলাম।

এক পত্রিকা থেকে হারুনের ইন্টারভিউ নিতে এসেছে। চিড়িং বিড়িং টাইপ বাইশ-তেইশ বছরের মেয়ে। চোখেমুখে কথা বলে। হারুন ইন্টারভিউ দিচ্ছে। কী বলতে কী বলে ফেলে এই ভয়ে মহসিন তাকে সাহায্য করতে গিয়েছিল। মেয়েটি তার দিকে তাকিয়ে বলেছে, আপনিও কি আত্মাহুতিতে আছেন ?

মহসিন বলল, না। মেয়েটি বলল, তাহলে আপনি কথা বলবেন না। যেদিন আপনিও আত্মাহুতির সিদ্ধান্ত নেবেন সেদিন আপনার ইন্টারভিউ নেব।

এই ধরনের মেয়েরা প্যাঁচে ফেলে অনেক গোপন কথা বের করে ফেলে। কিন্তু হারুন বেশ সহজভাবেই কথা বলছে। তাকে প্যাঁচে ফেলা যাচ্ছে না।

আপনি নিশ্চিত যে আগামীকাল রাত বারটা এক মিনিটে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন দেবেন ?

হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত।

গায়ে আগুন দেবার আগে যে কথাগুলি সবার উদ্দেশে বলবেন সেগুলি কি এখন বলবেন ? আমি লিখে নিতে পারি।

তখন কী বলব তা তো জানি না।

আপনার বাবা আপনার মা— তারা এই ব্যাপারটা কীভাবে নিচ্ছেন ?

আমি জানি না। তাদের জিজ্ঞেস করুন।

আমার কাছে কিন্তু মনে হচ্ছে পুরো ব্যাপারটাই সাজানো নাটক। আগামীকাল সন্ধ্যার পর থেকে আপনাকে এখানে পাওয়া যাবে না।

আপনার কী মনে হচ্ছে না হচ্ছে সেটা আপনার ব্যাপার।

কী খাচ্ছেন ?

চা খাচ্ছি। আলুর চপ খাচ্ছি। আমি অনশন করছি না। আমার খেতে বাধা নেই। আপনি চা খাবেন ? দিতে বলি ?

সফিক দূরে দাঁড়িয়ে বলল, খাল কেটে কুমীরের বদলে পাবলিক নিয়ে এসেছি। কুমীর সামলানো যায়। পাবলিক যায় না। আমাদের সামনে মহাবিপদ।

মুহিব তার বাবার বাসার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ঘর তালা দেয়া। সে চিন্তিত বোধ করল না। নিউ হোমিও হল খোলা আছে। এখানে আসার পথে চোখে পড়েছে। বুড়ো এক চশমা পরা ভদ্রলোক কুঁজো হয়ে খবরের কাগজ পড়ছেন। তাঁর কাছে গেলেই খোঁজ পাওয়া যাবে।

ডাক্তার সাহেবের নাম হাবীবুল্লাহ। বয়স সত্তরের কাছাকাছি। তিনি খবরের কাগজ থেকে একবার চোখ তুলে মুহিবকে দেখলেন। সে কী জন্যে এসেছে তা শুনলেন। হাত ইশারায় তাকে বসতে বলে আবারো কাগজ পড়তে লাগলেন। মুহিব কাঠের বেঞ্চে চুপচাপ বসে রইল। সকালবেলার বাসি খবরের কাগজ সে এর আগে কাউকে এত আগ্রহ করে পড়তে দেখে নি।

এক সময় তাঁর কাগজ পড়া শেষ হলো। তিনি মুহিবের দিকে কঠিন চোখে তাকালেন।

শামসুদ্দিন সাহেব তোমার পিতা?

জি।

পিতার খোঁজে এসেছ?

জি।

কে বলেছে যে আমি তাঁর খোঁজ জানি?

আপনি জানেন না?

জানলেও বলব না।

বলবেন না?

না। বৃদ্ধ পিতা। অসুস্থ, জ্বরে কাতর। তাকে বাড়ি থেকে পুলিশ দিয়ে বের করে দিয়েছে। জ্বরের কারণে সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না— আর আজ তুমি এসেছ পিতার খোঁজে? ফিটফাট বাবু সেজে এসেছ, গলায় টাই।

মুহিব চুপ করে আছে। বৃদ্ধকে রাগ কমানোর সময় দিতে হবে। খুব যারা রাগী তাদের রাগ ঝপ করে পড়ে যায়। তখন তাদের প্রতিটি কথা মায়ায় ডুবানো থাকে। এই বৃদ্ধের রাগ এক্ষুণি পড়বে।

তোমার নাম কী?

মুহিব।

ও! তাহলে তোমার নামই হুঁ-বাবা?

জি।

তোমার পিতা একবার খুবই অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। আজরাইলে-মানুষে দড়ি টানাটানি। আমি রোজ সন্ধ্যায় তোমার বাবার বিছানার পাশে বসে থাকতাম— তখন তো তোমাকে দেখি নাই। কোথায় ছিলা? ফুর্তি করতে ছিলা?

আমি খবর পাই নি। আমি সব সময় যে বাবার কাছে আসি তা-না। হঠাৎ হঠাৎ আসি।

তুমি তো দেখি বিরাট লায়েক পুত্র। হঠাৎ হঠাৎ আস। দরকার কী হঠাৎ হঠাৎ আসার? গলায় টাই বেঁধে বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াও। মদ খাও না তুমি? অবশ্যই খাও। চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে মদ খাওয়া লালটু চেহারা। তোমার সঙ্গে কথা বলা মানে সময় নষ্ট। মনের শান্তি নষ্ট। তুমি বিদায় হও।

মুহিব বসে রইল। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, বৃদ্ধের রাগারাগি শুনতে তার ভালো লাগছে। বৃদ্ধের গলায় রাগ আছে কিন্তু চোখে মায়া চলে এসেছে।

হুঁ-বাবা, আমার কথা মন দিয়ে শোন— তোমার পিতা কোথায় আছেন আমি জানি না। তিনি বলেছেন কোনো একটা থাকার জায়গা খুঁজে বের করে আমাকে জানিয়ে যাবেন। বুঝতে পেরেছ?

জি।

আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে। তাহলেই খোঁজ পাবে। তোমার সঙ্গে আমি খারাপ ব্যবহার করেছি, মনে কষ্ট নিও না। তুমি হলে বন্ধুপুত্র, বন্ধুপুত্র পুত্রের মতো। তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করার অধিকার আছে। আছে কি-না বলো।

জি আছে। চাচা আমি উঠি।

কিছু মুখে না দিয়ে উঠবে মানে কী? গরম সিঙাড়া দিয়ে চা খাও, তারপর যেখানে ইচ্ছা যাও। চড়ে বেড়াও।

গরম সিঙাড়া কোথায়?

বাসা থেকে আসবে। আমার বড় বৌমা নিজের হাতে বানিয়ে পাঠায়। একটা সিঙাড়া খেলে স্বাদ বাকি জীবন মুখে লেগে থাকবে।

মুহিব চুপচাপ বসে আছে। বসে থাকতে ভালো লাগছে। বৃদ্ধ চেয়ারে পা

তুলে আরাম করে বসেছেন। এতক্ষণ চোখে চশমা ছিল না। এখন চশমা পরেছেন। তীক্ষ্ণ চোখে মুহিবকে দেখছেন।

তোমার বাবা সব সময় বলত— আমার ছোট ছেলে গ্রিক দেবতা এপোলোর চেয়েও সুন্দর। তার কথাকে তেমন গুরুত্ব দেই নাই। বাবা-মা'রা নিজের সন্তানদের সম্পর্কে এই ধরনের কথা সব সময় বলে। কিন্তু এখন দেখছি তোমার বাবার কথায় অতিরঞ্জন থাকলেও বেশি না। আমি তোমার মতো সুন্দর চেহারার ছেলে একটা দেখেছিলাম। আখাউড়া রেলস্টেশনে। সে কমলা কিনছিল। সেই ছেলের চেহারা এখনো চোখে ভাসে। তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি— এটা মনে পুষে রাখ নাই তো ?

জি না।

আমি নিজের রাগ কমানোর অনেক চেষ্টা করছি। হোমিওপ্যাথিতে একটা ওষুধ আছে 'থুজা'। এর দুইশ পাওয়ার আমার মতো মানুষদের রাগ কমায়। ওষুধ খাচ্ছি, কাজ হচ্ছে না। নিজের ওষুধ নিজের উপর কাজ করে না।

মুহিব বলল, চাচা, রাগ বাড়ানোর কোনো ওষুধ কি আছে ?

বৃদ্ধ বিস্মিত হয়ে বললেন, কেন ?

মুহিব বলল, রাগ বাড়ানোর ওষুধ থাকলে আমি খেতাম। আমার মধ্যে কোনো রাগ নেই। বাবার কোনো স্বভাব আমি পাই নি, এই একটা স্বভাব পেয়েছি। বাবার যেমন রাগ নেই, আমারও নেই। একটু রাগ থাকলে ভালো হতো।

বৃদ্ধ মুহিবের দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর চোখ মমতা এবং ভালোবাসায় আর্দ্র।

সন্ধ্যা থেকে টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। এমন বৃষ্টি যে মাথায় ছাতা ধরতেও ইচ্ছা করে না, আবার ছাতা ছাড়া হাঁটতেও ভালো লাগে না। মুহিব বৃষ্টির ভেতর হাঁটছে। ঝুম বৃষ্টির সময় রিকশা বেবিটেক্সি কিছুই পাওয়া যায় না। টিপটিপে বৃষ্টির সময় একটু পরে পরে খালি রিকশা এসে পাশে থামে। রিকশাওয়ালা আগ্রহ নিয়ে জানতে চায়— কই যাবেন ? পারলে জোর করে রিকশায় তুলে নিবে এমন অবস্থা।

মুহিব কোথায় যাবে সে জানে। নোরার কাছে যাবে। নোরা হিপনোটাইজ না কী যেন করবে। কিন্তু মুহিবের মনে হচ্ছে নোরার কাছে যাবার আগে তাকে

অন্য কোথাও যেতে হবে। সেটা কোথায় তা মনে পড়ছে না। চেতন মন অবচেতন মনের কোনো ব্যাপার নিশ্চয়ই। সে কোথায় যাবে তা অবচেতন মনে আছে, চেতন মনে নেই।

তার কি মা'র কাছে যাবার কথা ? মা'কে সে-রকম কোনো কথা দিয়ে এসেছে ? না-কি বড়চাচার কাছে যেতে হবে ? বড়চাচা তাকে কিছু কিনতে দিয়েছেন, সে ভুলে গেছে। পাথরের হামানদিস্তা ধরনের কিছু। দি আল মদিনা হোটেলের খায়রুলের সঙ্গে কি ফার্নিচার কিনতে যাবার কথা দিয়ে ভুলে গেছে ? কোনো কিছুই মনে পড়ছে না। তার কি আলজেমিয়ার্স ডিজিজ হতে যাচ্ছে ? হলে মন্দ হয় না। ক খ গ ঘ থেকে শুরু করা।

নোরাদের বাড়িতে যাবার জন্যে রিকশায় ওঠা মাত্র মুহিবের মনে পড়ল তার আসলে যাবার কথা যূথীদের বাড়িতে। এই সিদ্ধান্ত সে নিজে নেয় নি। কেউ তাকে নিতেও বলে নি। সিদ্ধান্তটা মনের গভীরে কোনো এক অন্ধকার কোণায় লুকিয়ে ছিল। হঠাৎ বের হয়ে এসেছে।

দরজা খুলল যূথী।

মুহিব বলল, আমার নাম মুহিব। আপনি আমার খোঁজ করছিলেন।

যূথী কিছু বলল না। সে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখের দৃষ্টি স্থির। মুহিব বলল, আপনি বোধহয় আমাকে চিনতে পারছেন না ?

যূথী বলল, চিনতে পারব না কেন ? আসুন, ভেতরে আসুন।

মুহিব ঘরে ঢুকল। যূথী বেতের সোফার দিকে আঙুল উঁচিয়ে বলল, বসুন এখানে। যূথীর গলার স্বর কঠিন তবে শান্ত। মুহিব বসল। যূথী বসল ঠিক তার সামনের চেয়ারে। চাইনিজ হোটেলগুলি যেমন অন্ধকার অন্ধকার থাকে, বসার ঘরটাও সেরকম অন্ধকার। যদিও দু'টা টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। ঘরে মনে হচ্ছে কোনো লোকজনও নেই। যূথী একা। কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই। মাথার উপর ফ্যান ঘুরছে। ফ্যানেও শব্দ নেই।

যূথী বলল, আমি আপনাকে খুঁজছিলাম। আপনি যে সত্যি সত্যি আসবেন আমি ভাবি নি। আপনাকে আসতে দেখে আমি অবাকই হয়েছি। বাবাকে এখান থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে যে কাণ্ড করেছেন তারপর আমাদের মুখ দেখানোর কথা না। আপনি সাহসী মানুষ।

মুহিব বসে আছে। তাকিয়ে আছে যূথীর দিকে। তার খুবই পানির পিপাসা হচ্ছে। বুক-গলা শুকিয়ে কাঠ। পানির কথাটা যূথীকে কখন বলবে বুঝতে পারছে না।

যূথী বড় বড় করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। মনে হয় সে নিজেকে সামলাচ্ছে। ঐ রাতে মেয়েটাকে তেমন রূপবতী মনে হয় নি। আজ মনে হচ্ছে। রেগে গেলে কোনো কোনো মেয়েকে সুন্দর লাগে। এই মেয়েটি মনে হয় সেই রকম। মেয়েটি যাকে বিয়ে করবে তার উচিত হবে সারাক্ষণ খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেয়েটিকে রাগিয়ে রাখা। মুহিব বলল, আমাকে কেন ডেকেছেন ?

যূথী বলল, আপনাকে ডেকেছি বাবার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবার জন্যে। ঐ রাতের ঘটনার পর বাবার মাথায় কোনো কিছু হয়েছে। এলোমেলো কথা বলেন। মাঝে মাঝে আমাকেও চিনতে পারেন না। পিজির একজন সাইকিয়াট্রিস্ট বাবার চিকিৎসা করছেন। পিজির ঐ সাইকিয়াট্রিস্ট প্রফেসর রহমতউল্লা আপনাকে খবর দিয়ে আনতে বলেছেন।

কেন ?

কারণ, বাবা শুধু আপনার কথা বলেন। আপনার ব্যাপারটা তাঁর মাথায় ঢুকে গেছে। তাঁর কথা শুনে মনে হয় এই পৃথিবীতে আপনি ছাড়া তাঁর কোনো প্রিয়জন নেই।

আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

বাবার সঙ্গে কথা না বললে বুঝবেন না। ঐ রাতে প্রথম যখন আপনি আমাদের বাসায় ঢুকলেন, বাবা আপনাকে দেখে কী কারণে জানি খুবই খুশি হয়েছিলেন। আপনাকে তার অত্যন্ত আপনজন মনে হয়েছিল। ঐ অংশটাই বাবার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। আর সব ধুয়ে মুছে গেছে।

উনি কোথায় ?

বাবা বাসায় আছেন।

উনার সঙ্গে দেখা করে আমাকে কী বলতে হবে ?

আপনাকে কিছু বলতে হবে না। আপনি শুধু তাঁর কথা শুনবেন। তাঁর প্রতিটি কথায় সায় দিয়ে যাবেন। তারপর যেখান থেকে এসেছেন সেখানে চলে যাবেন।

ঠিক আছে।

আপনাকে আরেকটা কথা বলার প্রয়োজন মনে করছি।

বলুন।

আপনার মতো খারাপ মানুষ আমি আমার জীবনে দেখি নি। কোনো দিন দেখব এরকম মনে করি না। আপনার দিকে তাকিয়ে থাকতেও আমার ঘেন্না লাগছে।

আমি এক গ্লাস পানি খাব।

বাবার সঙ্গে দেখা করে আপনি চলে যাবেন। আমি আপনাকে পানি এনে দেব না।

অতি রুগ্ন একজন মানুষ বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। তাঁর চোখ জ্বলজ্বল করছে। মুখভর্তি খোঁচা খোঁচা সাদা দাড়ি। জাগ্রত মানুষ মূর্তির মতো শুয়ে থাকতে পারে না। সে সামান্য হলেও নড়াচড়া করে। মানুষটা তা করছে না। তাঁকে দেখে মনে হবে 'যেমন খুশি সাজো' প্রতিযোগিতায় মানুষটা শবদেহ সেজেছে। প্রতিযোগিতায় সে ফার্স্ট প্রাইজ জিতে নেবে এমন সম্ভাবনা আছে। যূথী শবদেহের কাছে গিয়ে বলল— বাবা, মুহিব সাহেব এসেছেন।

শবদেহে সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ সঞ্চার হলো। আরজু সাহেব হাতে ভর দিয়ে বিছানায় উঠে বসে অতি পরিচিত ভঙ্গিতে বলল, কখন এসেছ মুহিব?

মুহিব বলল, এই তো কিছুক্ষণ আগে।

আরজু বললেন, সেই কবে তোমার চা খেতে আসার কথা। আমি রোজ দুই তিন বার করে যূথীকে জিজ্ঞেস করি, মুহিব এসেছে? যূথী বলে— না।

মুহিব বলল, আমি ঢাকার বাইরে ছিলাম বলে আসতে পারি নি।

ভদ্রলোক আনন্দিত গলায় বললেন, আমি যূথীকে ঠিক এই কথাই বলেছি। আমি বলেছি মুহিব ঢাকার বাইরে আছে। ঢাকায় থাকলে অবশ্যই আসত। কথা দিয়ে কথা রাখবে না মুহিব এমন ছেলে না। আমি তার নাড়ি-নক্ষত্র চিনি। মুহিব, আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয় তুমি যূথীকে জিজ্ঞেস কর।

মুহিব বলল, আপনার কথা বিশ্বাস হবে না কেন? অবশ্যই বিশ্বাস হচ্ছে।

না না, কোনোরকম সন্দেহ থাকা উচিত না। যূথী তুই বল আমি তোকে বলেছি না মুহিব ঢাকায় নেই?

যূথী যন্ত্রের মতো গলায় বলল— হ্যাঁ, বলেছ।

মুহিব বলল— যূথী, আপনি চা নিয়ে আসুন। আপনার বাবার সঙ্গে বসে চা খাই।

আরজু সাহেব বললেন, এখন কী চা খাবে? রাত ন'টা বাজে। রাত ন'টার সময় কেউ চা খায়? তুমি ভাত খেয়ে যাবে।

যূথী বলল— বাবা, উনাকে খেতে দেবার মতো কিছু ঘরে নেই।

আরজু সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, মুহিবকে খাওয়ানোর জন্যে কি পোলাও, কোর্মা, কোপ্তা, কালিয়া লাগবে ? সে ঘরের ছেলে। যা আছে তাই খাবে।

যূথী কঠিন গলায় বলল— বাবা, ঘরে কিছুই নেই।

শুকনা মরিচ আছে ? শুকনা মরিচ ভেজে পেঁয়াজ দিয়ে ডালের ভর্তা বানিয়ে দে। আমি আর মুহিব শুকনা মরিচ দিয়েই ভাত খাব। ডাল যদি থাকে তো ভালো। না থাকলেও কোনো অসুবিধা নেই।

মুহিব বলল, আরেকদিন এসে খেয়ে যাব। আজ আমার একজনের সঙ্গে দেখা করতে যেতেই হবে। কথা দিয়ে রেখেছি। সে অপেক্ষা করে আছে।

ভদ্রলোক বললেন, কথা দিয়ে থাকলে যাও। কথার বরখেলাপ আমার পছন্দ না। কাজ সেরে চলে এসো। রাত একটা দু'টা তিনটা কোনো অসুবিধা নেই। আমার শরীরটা ভালো না। রাতে এমনিতেই ঘুম হয় না। বলতে গেলে সারারাত জেগেই থাকি। ডাক্তারদের ধারণা মাথায় গণ্ডগোল হয়েছে। চিকিৎসা হচ্ছে। বাবা, তুমি কিন্তু চলে আসবে। যদি রাত বেশি হয়ে যায়, খাওয়া-দাওয়া করে এখানেই শুয়ে থাকবে। আলাদা ঘর আছে। আরাম করে ঘুমাবে।

যূথী মুহিবকে সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে চাপা গলায় বলল, আপনি অবশ্যই আসবেন না। অবশ্যই না। আপনাকে খবর দিয়ে আনাই আমার ভুল হয়েছে। বাবাকে সুস্থ করার জন্যে আমার আপনার মতো দুষ্ট মানুষের প্রয়োজন নেই।

মুহিব কিছু বলছে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। যূথী তীব্র গলায় বলল, এত বড় অন্যায় করার পরেও আপনি কিন্তু এখন পর্যন্ত ক্ষমা চান নি।

আপনার বাবার কাছে ক্ষমা চাওয়া ঠিক হবে না। ক্ষমা চাইলেই পুরনো ঘটনা মনে পড়ে যেতে পারে।

একটু দাঁড়ান। পানি খেতে চেয়েছিলেন, পানি নিয়ে আসি।

আমার পানির তৃষ্ণা চলে গেছে। পানি লাগবে না।

মুহিব সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে। একবার পিছন ফিরে তাকাল। যুথী মেয়েটা দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছে মেয়েটা কাঁদছে। রাগে-দুঃখে কাঁদছে। কাঁদলেও কি মেয়েটাকে সুন্দর দেখায় ? নিশ্চিত হবার জন্যে আরেকবার তাকানো দরকার। মুহিব তাকাল না। রাস্তায় নেমে এলো।

বৃষ্টি বেড়েছে। এখন বড় বড় ফোঁটা পড়ছে। সামান্য বাতাসও দিচ্ছে। রাত বেশি হয় নি, মাত্র ন'টা বাজে। বৃষ্টি বাদলার কারণে রাস্তায় লোক চলাচল কম। মনে হচ্ছে অনেক রাত। মুহিব মন স্থির করতে পারছে না। সরাসরি নোরাদের বাড়িতে চলে যাবে নাকি প্রেসক্লাব হয়ে তারপর যাবে।

মুহিব রিকশা নিল। রিকশাওয়ালা রিকশার হুড তুলতে গেল। মুহিব বলল, লাগবে না। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে যাব। রিকশাওয়ালা সন্দেহ ভরা চোখ নিয়ে তাকাচ্ছে।

অনেক অনেক কাল আগে ময়মনসিংহ শহরে সে একবার তার বাবার সঙ্গে রিকশা করে যাচ্ছিল। হঠাৎ ঝুম বৃষ্টি নামল। শামসুদ্দিন সাহেব ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, হ্যালো হুঁ বাবা, বৃষ্টিতে ভিজবি? মুহিব বলল, হুঁ।

তিনি রিকশার হুড নামিয়ে দিলেন। দু'জন বৃষ্টিতে কাক ভেজা হয়ে রিকশায় বসে আছে। লোকজন দেখে মজা পাচ্ছে। শামসুদ্দিন সাহেব ছেলেকে বললেন, হা করে বৃষ্টির পানি খা। ফ্রেস ওয়াটার। বৃষ্টির পানির টেস্টই অন্যরকম। চলন্ত রিকশায় বসে পিতাপুত্র দু'জনই হা করে বৃষ্টির পানি খাওয়ার চেষ্টা করছে। আহারে, কী সুন্দর দৃশ্য!

মুহিব রাগী মেয়েটাকে বলেছিল পানির তৃষ্ণা মরে গেছে। কথাটা সত্যি না। তার তৃষ্ণা ভালোই আছে। সে শৈশবের মতো হা করে বৃষ্টির পানি খাবার চেষ্টা করছে।

রিকশাওয়ালা ঘাড় ফিরিয়ে চিন্তিত মুখে দৃশ্যটা দেখল। বিড়বিড় করে বলল, আপনে যাইবেন কই?

মুহিব বলল, কোথায় যাব সেই সিদ্ধান্ত এখনো নিতে পারি নি। প্রথমে প্রেসক্লাবে যেতে পারি আবার অন্য কোথাও যেতে পারি।

আমি ঐ দিকে যামু না। আপনে নামেন।

মুহিব শান্ত গলায় বলল, না গেলে যেও না। আমি কিন্তু রিকশা থেকে নামব না। তোমার রিকশাটা আমার পছন্দ হয়েছে।

রিকশাওয়ালা ভীত গলায় বলল, স্যার আমি গরিব মানুষ।

মুহিব বলল, আমিও গরিব মানুষ। গরিবে গরিবে কাটাকাটি। ঝামেলা না করে রিকশা চালাও। আমার কাছে শেষ পঞ্চাশটা টাকা আছে। পঞ্চাশ টাকায় যতটুক যাওয়া যায় যাবে। তবে শেষ দফায় এইখানে নিয়ে আসবে। যাত্রা যেখান থেকে শুরু সেখানেই শেষ।

বৃষ্টির বেগ বাড়ছে। মুহিবের ভিজতে ভালো লাগছে।

সফিকদের পুরো দলটা এখন আছে খায়রুলের ফ্ল্যাট বাড়িতে। বৃষ্টি মাথায় নিয়ে প্রেসক্লাবের সামনে বসে থাকার কোনো মানে হয় না। তাছাড়া হারুন অসুস্থ। তার জ্বর এসে গেছে, চোখ লাল। কথাবার্তাও কেমন অসুস্থ। সে চাদর গায়ে দিয়ে কুণ্ডুলি পাঁকিয়ে শুয়ে আছে। দলের সবাই প্রথমে এই ঘরেই ছিল। সিগারেটের গন্ধে হারুনের বমি আসছে বলে তারা অন্য ঘরে।

সফিক বলল, আমরা আর প্রেসক্লাবের সামনে ফিরে যাচ্ছি না। আত্মাহুতির কথা সবাই ভুলে যাও। যা করা হয়েছে যথেষ্ট করা হয়েছে। খামাখা গায়ে আগুন দিয়ে মরে যেতে হবে কেন?

মহসিন বলল, আমাদের পাবলিসিটি যা হয়েছে রাস্তায় আর নামা যাবে না। পাবলিক আমাদের দেখলেই ফটকাবাজ বলে গায়ে পেট্রোল ঢেলে দেবে।

সাবের বলল, পাবলিক আমাদের পাবে কোথায়? আমরা হাইবারনেশনে চলে যাব। খায়রুল ভাইয়ের একটা ভালো জায়গা পাওয়া গেছে। এইখানেই থাকব। এইখানেই ঘুমাব।

খায়রুল বলল, কোনো অসুবিধা নাই। যত দিন ইচ্ছা থাকেন।

মহসিন তার বিশেষ হাবিজাবি তৈরি করেছে। হাবিজাবির নাম 'খবর আছে'। নরমালটা না, এক্সট্রা পাওয়ার। দু'গ্লাস খেলেই খবর হয়ে যাবে বলেই নাম 'খবর আছে'। কয়েকদফা শরবত খাওয়া হয়ে গেছে। এইসব হাবিজাবি খায়রুলের খাওয়ার অভ্যাস ছিল না। দলের সঙ্গে পড়ে পরপর তিন গ্লাস খেয়েছে। তার কাছে মনে হচ্ছে এই জীবনে এত আনন্দ সে পায় নি। শিক্ষিত বিএ এমএ পাস ছেলেরা তার মতো মানুষের বাড়িতে সহজ-স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বসে আছে। দেখতেই ভালো লাগছে। খায়রুল বলল, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কি করব?

সফিক বলল, খাওয়ার ব্যবস্থার দরকার নেই। আজ সারারাত শুধু দাওয়া।

খায়রুল বলল, দাওয়া কী?

মহসিন বলল, যে জিনিস খাচ্ছেন তার নাম দাওয়া। আপনি তিনটা খেয়েছেন। চার নম্বর পেটে পড়লে বুঝবেন দাওয়া কাকে বলে।

খায়রুল বলল, এইসব খেয়ে মরে যাব না তো ভাইজান?

মহসিন বলল, মরে গেলে মরে যাবেন। বেঁচে থেকে লাভ কী?

খায়রুল বলল, কোনো লাভ নাই।

তৌফিক বলল, আপনি যে মাথার ঘাম পেয়ে ফেলে এত কষ্ট করে টাকা-পয়সা করেছেন, লাভটা কী হয়েছে? মনের কষ্ট কি দূর হয়েছে?

জি-না, দূর হয় নাই।

তাহলে এসব রেখে লাভ কী? 'খবর আছে' শরবত আরো দুই গ্লাস খান— তারপর আসেন সবাই মিলে আপনার ফ্ল্যাট বাড়িতে আগুন দিয়ে দেই।

খায়রুল গ্লাসে লম্বা চুমুক দিয়ে বলল, আপনারা যা ভালো মনে করেন।

সাবের বলল, কোথাও না কোথাও আগুন দেয়া আমাদের জন্যে ফরজ হয়ে গেছে। গায়ে আগুন দিতে না পেরে হারুন বেচারা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। বড় কোনো আগুন দেখলে যদি তার মনটা ভালো হয়।

'খবর আছে' শরবত শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে। মহসিন অতি ব্যস্ত হয়ে দ্বিতীয় দফা বানাচ্ছে। একজনকে পাঠানো হয়েছে বরফ আনতে।

মহসিন বলল, এইবার যে জিনিস বানাব তার নাম 'আগুন ধিকি ধিকি'। চুমুকে চুমুকে শরীরে আগুন জ্বলবে।

ইয়াকুব বলল, 'আগুন ধিকি ধিকি' নামটা ভালো লাগছে না। আগুন শব্দটা কেমন ম্যাড়া ম্যাড়া। পাওয়ার নেই। বরং 'অগ্নি ধিকিধিকি' ভালো নাম। অগ্নি যুক্তাক্ষরের শব্দ। ফোর্সফুল হয়।

নীরব ঘাতক সাবের বলল, অগ্নি ফগ্নি কিছুই চলবে না। ইংরেজি-বাংলা মিশিয়ে নাম দিতে হবে। যেমন— Fire ধিকিধিকি।

মহসিন বলল, ফায়ার ছাড়া আগুনের আর কোনো ইংরেজি প্রতিশব্দ আছে?

ইয়াকুব বলল, নেই। ইংরেজি তো আর বাংলার মতো না। ওরা একটা শব্দ নিয়েই খুশি আর আমাদের আছে— আগুন, অগ্নি, অনল, বহ্নি।

সফিক বলল, তোরা কী প্যাঁচাল শুরু করলি? নাম কোনটা সিলেক্ট হয়েছে? আগুন ধিকি ধিকি না-কি ফায়ার ধিকিধিকি?

মহসিন বলল, আমার কাছে কেন জানি ফায়ার ধিকিধিকিটা বেশি ভালো লাগছে।

সফিক বলল, তুই হচ্ছিস মূল কারিগর। তোর যদি ফায়ার ধিকিধিকি নাম ভালো লাগে তাহলে এই নামই থাকবে। এখন তাড়াতাড়ি জিনিস তৈরি কর।

মহসিন বলল, বরফ আসুক।

সাবের বলল, ফায়ার বানাতে বরফ লাগবে এটা কেমন কথা?

সফিক বলল, শুধু কথা। শুধু কথা। আমার কাছে অসহ্য লাগছে। বরং জিনিস আনতে আনতে গান-বাজনা হোক। খায়রুল ভাই, আপনার ফ্ল্যাটবাড়িতে গান-বাজনা করলে অসুবিধা আছে?

খায়রুল রাগী গলায় বলল, কীসের অসুবিধা ? আমার নিজের টেকায় কিনা বাড়ি। কারো বাপের টেকায় কিনি নাই।

সাবের বলল, খায়রুল ভাইয়ের অবস্থা দেখেছিস ? জিনিস মাত্র তিনটা পেটে পড়েছে, এর মধ্যেই গলা পরিষ্কার হয়ে গেছে। প্রতিটা শব্দ বোঝা যাচ্ছে।

সফিক গান শুরু করল— 'আমরা পুতুলওয়ালা, পুতুল বেচে যাই।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই গানের কথাবার্তায় কিছু রদবদল হলো।

আমরা আগুনওয়ালা, আগুন দিয়ে যাই
কে নিবি ভাই
কার আগুন চাই
আমরা আগুনওয়ালা।

গানের মাঝামাঝি সময়ে মুহিব এসে উপস্থিত হলো। সফিক গান থামিয়ে বিরক্ত গলায় বলল, তোর এতক্ষণে সময় হলো ? ছিলি কোথায় ?

মুহিব জবাব দিল না।

সফিক বলল, শরীর খারাপ নাকি ? শরীর খারাপ লাগলে হারুনের সঙ্গে গিয়ে শুয়ে থাক।

মুহিব বলল, শরীর ঠিক আছে।

সফিক বলল, গায়ের কাপড় তো সব ভিজা। কাপড় বদলাবি না ?

মুহিব বলল, না।

সে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে পড়ল।

রাত দু'টার দিকে সবার পেটেই কিছুটা ফায়ার ধিকিধিকি পড়ল। জিনিসটা সুস্বাদু। টক মিষ্টি ঝাল। তবে ঝাঁজ আগুনের মতোই। কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিস্থিতি পাল্টে গেল। নীরব ঘাতক সাবের বলল, ফায়ার ধিকিধিকি খাওয়া হচ্ছে আগুন ছাড়া এটা কেমন কথা ? টিন ভর্তি কেরোসিন তো আছেই। ঘরে আগুন লাগিয়ে দিলে কেমন হয় ?

খায়রুল জড়ানো গলায় বলল, না তো ভাইজান করি নাই। দেন লাগায়ে। জ্বলেপুড়ে যাক।

মহসিন বলল, রোম নগরী যখন পুড়ছিল তখন নিরো বাঁশি বাজাচ্ছিল।

সফিক বলল, একটা ফ্ল্যাট বাড়ি পুড়িয়ে কী হবে ? পুরো দেশটা পুড়িয়ে দিতে পারলে মন শান্ত হতো।

সাবের বলল, দেশটা তো পুড়িয়ে দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। আমাদের সাধ্যে যা আছে তা করি। ফ্ল্যাটটায় আগুন লাগিয়ে পগার পার হয়ে যাই।

ফায়ার ধিকি ধিকির জগ শেষ হলো রাত তিনটায়। তিনটা দশ মিনিটে টিন ভর্তি কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে তারা শান্ত ভঙ্গিতে নিচে নেমে এলো। চারদিকে হৈচৈ চেঁচামেচি হচ্ছে। শুনতেও ভালো লাগছে। আগুন ভালোমতো ধরে গেছে। তিনতলার ফ্ল্যাট বাড়ির জানালা দিয়ে কালো ধোঁয়া বের হচ্ছে। এই দৃশ্যও সুন্দর।

সাবের বলল, কন্যার বাপে হুক্কা খায়, বুনকা বুনকা ধোঁয়া যায়।

সাবেরের ছড়া বলা শেষ হবার আগেই মুহিব চেঁচিয়ে বলল, হারুন ভাই কোথায়? হারুন ভাই তো নিচে নামে নাই। সর্বনাশ!

মুহিব ছুটে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে। তার পেছনে পেছনে বন্ধুরাও উঠছে।

সব পত্রিকার প্রথম পাতায় খবরটা এসেছে। 'প্রথম আলো'-য় এসেছে ছবিসহ দীর্ঘ প্রতিবেদন।

তরুণ প্রতিবাদী যুবকের আত্মাহুতি

নগরীতে শোকের ছায়া

হারুন ঘোষণা দিয়েছিলেন গায়ে আগুন দিয়ে প্রতিবাদ জানাবেন। তার ঘোষণা কেউই তেমন গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে নি। সেই অভিমানেই কি তিনি ঘোষণার চব্বিশ ঘণ্টা আগেই চলে গেলেন ? তাঁকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে গিয়ে তার এক বন্ধু মুহিব গুরুতর অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক।

প্রবল ঘোরের ভেতর মুহিবের সময় কাটছে। ব্যথা-বোধহীন জগৎ। কখনো শরীর হালকা হয়ে যাচ্ছে, সামান্য বাতাস এলেই সে উড়ে চলে যাবে। আবার কখনো শরীর ভারি হয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে সে ক্রমেই নিচে নামছে। ক্রমেই নিচে নামছে। সে নেমে যাচ্ছে অতল কোনো গহ্বরে।

মুহিব সারাক্ষণ তার মাথায় বৃষ্টির শব্দ শোনে। ঘোরের মধ্যেই সে অস্থির বোধ করে। তার মনে হয় ঝুম বৃষ্টিতে তাকে কোথায় যেন যেতে হবে। কেউ একজন তাকে বলেছিল, 'ঝুম বৃষ্টিতে আমার কাছে আসবে'। সেই একজনের ছবি কখনো তার মাথায় স্পষ্ট হয় না।

নানান ধরনের ছবি তার চোখের সামনে ভাসে। কখনো সে দেখে— সে তার বাবার সঙ্গে রিকশা করে যাচ্ছে। মাথার উপর বৃষ্টি পড়ছে। তারা দু'জন হাঁ করে বৃষ্টির পানি খাচ্ছে।

কখনো দেখে কুমুদ স্যার এসেছেন তার কাছে। স্যারের গায়ে কোনো কাপড় নেই। স্যার দুঃখিত গলায় বললেন, কই বাবা তুমি তো সেন্টটা দিলে না ? সেন্ট ছাড়া চলতে পারি না বলে গায়ে আজেবাজে সেন্ট মাখি। ফিনাইলের মতো গন্ধ। তখন মুহিব তীব্র ফিনাইলের গন্ধ পায়, তার সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করে ওঠে।

মুহিব বুঝতে পারে এইসব ছবি সে ঘোরের মধ্যে দেখছে। বাস্তবে এমন কিছু ঘটছে না। তার চারপাশের জগতের কোনো ছবি কোনো শব্দই তাকে স্পর্শ করছে না।

সামান্যতম চেতনা যদি তার থাকত তাহলে তার ভালো লাগত। সে দেখত তার জীবন নিতান্তই বৃথা যায় নি। তার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে নোরা মেয়েটা যতটা ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে ততটাই ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে যূথী।

হাসপাতালের বাইরে অনেক লোক। মুহিবের বাবা শামসুদ্দিন সাহেবও তাদের মধ্যে আছেন। তাঁর শরীর খুবই দুর্বল। তিনি মেঝেতে বসে আছেন।

তাঁর পাশেই তাঁর পিঠে হাত দিয়ে বসে আছেন হোমিওপ্যাথ ডাক্তার রহমতউল্লাহ। এক সময় শামসুদ্দিন সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। জড়ানো গলায় বললেন, আমার ছেলে যদি আপনাদের কারো সঙ্গে কোনো অন্যায় আচরণ করে থাকে, দোষ করে থাকে তাহলে আপনারা ক্ষমা করবেন। আমি তার বাবা হিসেবে সবার কাছে ক্ষমা চাই। আমার হুঁ-বাবা তার জীবনে কিছুই পায় নাই। সবার ক্ষমাটা যেন পায়।